ধূমকেতু

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

কমলা বুক ডিপো
বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো,
১৫, বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—২॥০

প্রিণ্টার—শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস
শ্রীপতি প্রেস
১৪নং ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

এই গল্প ও কথিকাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায়—'সবুজ পত্র', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কথিকাগুলি এক সময়ে "সেবিকা" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারেও বাহির হইয়াছিল। সে সংস্করণ অনেক দিন নিঃশেষিত হওয়ায় আর স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত না করিয়া এই পুস্তকের শেষাংশে "কথিকা" নামে সংযোজিত হইল। ইতি ১লা বৈশাখ, সন ১৩৫২।

ম্যানেজার,
কমলা বুক ডিপো

সূচী

গল্প-

কথিকা—

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

শ্রীচরণকমলেষু

—গল্প—

ধূমকেতু

রোগটা সেরে গেছে অথচ রোগের সমস্ত গ্লানিটা যায় নি—এমন অবস্থায় মনের মধ্যে যে একটা স্থিরতা অনুভব করা যায়, তা' জীবনের কর্মব্যস্ত দিনগুলোতে করা সম্ভব নয়। এই সন্ধিদিনগুলোই জীবনের সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য, কেননা মন একেবারে দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পরিপূর্ণ শান্তিতে বিরাজ করে একমাত্র এই দিনগুলোতেই।

এ সত্যটার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সবে মাত্র নুমনিয়া থেকে সেরে উঠে।

শীতকালের মধ্যাহ্ন। দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায় আরাম-কেদারায় শুয়ে আছি। গায়ে বালাপোষ জড়ানো; পাশের টিপয়ে ওষুধের শিশি আর গ্লাস। বারান্দার কোণে শা'-চৌধুরীদের কাঁঠাল গাছের পত্রঘন ডালগুলি এসে পড়েছে; তাদেরই বাড়ী-সংলগ্ন বাগানে একটি গাভী রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে; একটা কাকের ক্লান্ত রব মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে!···আকাশের ঘন নীল, সূর্য্যের মৃদু তাপ, বাতাসে ঈষৎ শীতাভাব—পৃথিবীর এই নিতান্ত পুরোণো জিনিসগুলো আমাকে আবার নূতন ক'রে অনুভব করতে হচ্ছে।...সিমেন্ট করা ধূলিবিহীন সিঁড়ির উপর কর্ম্মরতা স্ত্রীর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি; স্নিগ্ধ-শীতল ঘরের ভিতর থেকে তার চুড়ীর মৃদু আওয়াজ আর সাড়ীর

খস্‌খসানি কানে আস্‌ছে। মনে হচ্ছে এগুলোর ভিতর দিয়ে যেন আবার নূতন ক'রে স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে।

নূতন ক'রেই বটে। মীরাকে যেন আজ আবার ফিরে পেয়েছি।... কিন্তু তাকে হারিয়ে ছিলামই বা কবে?

হারিয়েছি আমার বাল্য-বন্ধুকে। অসুখের দরুণ মাঝখানে যে মেঘটা উঠেছিল, সেটা কেটে গেছে এবং তার সঙ্গে বাল্যবন্ধু সমীও বিদায় নিয়েছে। দুঃখের বিষয়। সেটা যে কত বড় দুঃখের বিষয়, তা' কেউ বুঝবে না। কিন্তু আমি নিজে এটা বুঝেছি, বাল্যবন্ধুকে হারিয়েও বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু স্ত্রী নৈলে আমার জীবনের দিন-গুলো একেবারেই অচল হবে।

আজ রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে ভাবছি—যার সেবা পাবার অধিকার নিয়ে জন্মেছি, তাকে কি কখনো পূর্ণভাবে পেয়েছিলাম? তার হৃদয়ের সঙ্গে সত্যই কি আমার কখনো পরিচয় হয়েছিল? না, একজনের ত্যাগের ভিতর দিয়েই তাকে আবার বরণ করে নিতে হবে? ফিরে পাওয়া নয়—হয়ত সমস্ত পুঁথিটাই আবার গোড়ার পাতা থেকে সুরু করতে হবে।

সেই থেকে বন্ধু সমী-র তো কোন খবর নিতে পারিনি। একবার শুনলাম, হাঁসপাতালেই তার মৃত্যু হয়েছে; আবার কে যেন ব'ললে, সেখান থেকে সেরে উঠে চলে গেছে।

যেখানেই যাক, সে আমাকে জীবন এবং জীবনের চেয়েও বেশী কিছু দিয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সঙ্গে নিয়ে গেছে—তার নিজের জীবনের একটা অনিশ্চিত পরিণাম।

ধূমকেতুর মতই সে আমার ভাগ্য-গগনে দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু—

কিন্তু, গোড়ার কথাটা এখনো বলা হয় নি।

এইবার ব'লব—একেবারে গোড়া থেকেই।

* * * *

কলিকাতার বুকের উপর দিয়ে যে বড় রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, তারই সমান্তরাল একটা মাঝারি গোছের রাস্তার পশ্চিম দিক থেকে যে গলিটা আরম্ভ হয়ে উত্তর দিকের আর একটা রাস্তায় শেষ হয়েছে—সেই গলিটার সমস্তটা জুড়ে বসেছিলাম আমরা উনিশ ঘর ভদ্র গৃহস্থ। আমাদের মধ্যে কেউ ছিলেন উকীল, কেউ ছিলেন কেরাণী, একজন ডাক্তার ছিলেন এবং দু'একজন উমেদার-বেকারও যে না ছিলেন এমন নয়।

আমাদের এ উনিশটা ঘর ছিল যেন একটা সমগ্র পরিবার। আমরা সকলেই চিন্তা করতাম একই রকমে এবং কাজ করতাম একই নিয়মে। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যগুলো—দন্তধাবন থেকে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত—আমাদের এমনিই প্রণালীবদ্ধ ছিল যে, আমরা যে-কেউ যখন ইচ্ছা ব'লে দিতে পারতাম যে আমাদের মধ্যে আর-কেউ এখন কি করছে এবং পাছে এইটে না বলতে পারি, এই ভয়ে বাইরের লোকের এই গলিতে এসে থাকাটা বড় পছন্দ করতাম না।

আমাদের এই উনিশটি পরিবারের মধ্যে পরিচয়টা খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এবং সেটাকে অটুট করে নিয়েছিলাম একটা না একটা কিছু সম্পর্ক পাতিয়ে।

এই থেকেই একটু ইংগিত পাওয়া যাবে যে, আমরা কলিকাতায় বাস ক'রলেও ঠিক কলিকাতার অধিবাসী ছিলাম না। কলিকাতার লোকের তরল বন্ধুত্বটা আমাদের কাছে নিতান্ত মৌখিক হৃদয়হীন বলেই বোধ হ'ত। তাদের ভদ্রতা এবং সামাজিকতায় আমরা ঠিক স্বস্তি অনুভব ক'রতে পারতাম না। কেন যে পারতাম না তা' তখন না হলেও এখন কতকটা বুঝতে পারি। সম্পর্কিত এবং অসম্পর্কিত

এ দুয়ের মাঝখানে "পরিচিত" ব'লে যে একটা জীবেরও স্থান থাকতে পারে, তা' আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন ছিল। যে সমাজ থেকে আমরা এসেছিলাম, সেখানে আলো এবং অন্ধকারের ব্যবধান যতটা সুস্পষ্ট, সামাজিকতার সন্ধ্যারাগে সেটাকে মিলিয়ে দিবার চেষ্টারও ছিল তেমনি একান্ত অভাব।

কিন্তু এসত্ত্বেও আমরা যে মূর্খ বা অশিক্ষিত ছিলাম, এ কথা এমন কি কলিকাতার লোকেরাও ব'লতে পারত না। আমাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী। এমন কি আমাদের এই উনিশ বাড়ীর মেয়েদের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় তথা বিদ্যালয়-শিক্ষার অভাব ছিল না। তাঁরা বাংলা চিঠি লিখতে বানান ভুল করতেন না, ইংরাজীতে খামের উপর শিরো-নামা লিখতে পারতেন এবং ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ধোপা এবং গয়লার হিসাব রাখতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে শিল্পকলার চর্চাও যথেষ্ট ছিল এবং তার পরিচয় পাওয়া যেত আমাদের ব্যয়ের এবং পাড়ার দর্জির আয়ের স্বল্পতায়। তাঁদের স্বাধীনতায়ও কোন বাধা ছিল না। পাড়ার মধ্যে পদব্রজে এবং পাড়ার বাইরে গাড়ীর দরজা খুলে যাতায়াত করতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। অন্য বিষয়ে যাই হোক্, এ-সব বিষয়ে আমরা কলিকাতাবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলাম এবং এই সম্পর্কে তাদের নীরব উপেক্ষা অথবা তরল পরিহাস যে নিতান্তই ঈর্ষ্যা-সঞ্জাত ছিল, সে বিষয়ে আমাদের কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

কলিকাতার লোকের মত আমরা কোনরূপ কু-অভ্যাস—ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি সহ্য করতে পারতাম না। তার কারণ আমাদের মধ্যে নীতি-চর্চাটা খুবই প্রবল ছিল। এই পাপ পৃথিবীতে নিষ্পাপ-

ভাবে জীবন-যাত্রা করবার মত সম্বল আমরা গুরুজনের কাছ থেকে যথেষ্টই পেয়েছিলাম।

সমী পরিহাস করে ব'লত—আমরা নিজেরা যে সমস্ত পাপের ঊর্ধ্বে ছিলাম—শুধু তাই নয়, অপরে যে সমস্ত পাপগুলো একচেটে ক'রে নেবে, এ কল্পনাও আমাদের পীড়া দিত। কিন্তু সমী ছিল পাড়ার—যাকে বলে—l'enfant terrible, তার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

আমাদের এই ঊনিশটি পরিবারের মধ্যে সমী-র পিতা সর্বেশ্বর বাবুই ছিলেন একমাত্র নিজ কলিকাতার অধিবাসী। তিনি থাকতেন ১৭ নম্বর বাড়িটায়। সেটা তাঁর নিজেরি ছিল, আগে ভাড়া খাটত। মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হবার পর ভাড়াটে তুলে দিয়ে নিজেই সেখানে এসে বসবাস ক'রতে আরম্ভ ক'রলেন। আমাদের গলির সৌর-চক্রের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট গ্রহ না হ'লেও তাঁর গতিটা আর সকলের মতই অনেকটা নিয়মিত ছিল। তাঁর ভদ্র এবং অমায়িক ব্যবহারে অনেক সময়ে ভুলে যেতে হ'ত যে তিনি আমাদেরই একজন নন। কিন্তু সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে যখনই তাঁর সঙ্গে কোন একটা কিছু সম্পর্ক পাতাতে গেছি, তখনই তাঁর ভিতরের একটা অনির্দিষ্ট কিছু আমাদের সরল উচ্ছ্বাসকে বাধা দিয়েছে। অতিমাত্র শিষ্টাচারের বর্ম ভেদ ক'রে তাঁর অন্তস্থলের পরিচয় পাবার সম্ভাবনা আমাদের কিছুমাত্র ছিল না। খুব খোলাখুলি ভাবে মিশলেও আমরা যে তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলাম না, এটা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হত না। আমাদের মধ্যে যাঁদের উপার্জনের কড়ি তিন-চার হাজারের কোঠাও পেরিয়ে যেত, তাঁরাও কলিকাতার এক বনিয়াদি বংশের এই নষ্ট-সম্পত্তি বংশধরের সঙ্গটা খুব স্বস্তিকর ব'লে বোধ ক'রতেন না। তাঁরা নিজে হ'তেই বুঝতে পারতেন যে, গরীব হ'লেও এ ব্যক্তিটি জাত্যংশে অর্থাৎ

সামাজিক স্তরে তাঁদের অনেক উঁচুতে এবং এ অনুভূতিটা তাঁদের পক্ষে যে খুব সুখকর ছিল তা' নয়।

এ সব সত্ত্বেও তিনি প্রথমটা আমাদের সৌর-চক্রের গতিটা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু বিপত্নীক হওয়ার পর থেকে গতির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মতিও বদলে গেল। বয়স্কদের কোন মজলিসেই তাঁর আর দেখা পাওয়া যেত না;—এমনভাবে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন যে, পাড়ার পরহিতকামীরাও তাঁর বিষয়ে একেবারে হতাশ হয়ে প'ড়ল। তাঁর সকাল-সন্ধ্যার অবসর কাটত নিজের পাঠাগারে —বই আর চুরুট নিয়ে, এবং ভৃত্য-প্রতিপালিত তাঁর পুত্র সমী-র ত্রিসন্ধ্যা কাটতে লাগল ছাদের উপরে—ঘুড়ি আর পায়রা নিয়ে।

সমী-র স্বাধীনতায় আমাদের হিংসাও হ'ত, ভয়ও হ'ত। হিংসা হ'ত, কেননা সেটা ছেলেমানুষের স্বভাব; ভয় হ'ত, কেননা আমাদের মধ্যে ছিল ছেলেমানুষির অভাব। আমরা যাঁকে ছাত্রজীবনের আদর্শ ব'লে মেনে নিয়েছিলাম তাঁর বাল্যকালটায় ভালমানুষির প্রভাবটা বড় বেশী ছিল—ঠিক বিদ্যাসাগরের মত নয়।

ইস্কুলের গণ্ডিটা কোন রকমে পেরিয়ে কলেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সমী-র সামনেকার চুলগুলো অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেলে এবং পিছনের চুলগুলো ঠিক সেই অনুপাতে খাটো হয়ে এল। এতে আমরা সকলেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলাম; কিন্তু যখন তার সিগারেটের ধোঁয়া শুধু আমাদের নয় আমাদের গুরুজনদেরও নাসারন্ধ্রে ঢুকতে লাগল, তখন আমরা একেবারেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পাড়ার পরহিতকামীরা যখন এ সংবাদটা সর্বেশ্বরবাবুর গোচর করলেন, তখন তিনি তাতে একটুও বিচলিত হ'লেন ব'লে বোধ হ'ল না।

সমী-র কিন্তু এ সবেতে মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অপরের

মুখচেয়ে কাজ করা সে বড় শ্রেয় ব'লে মনে করত না এবং নিজের মুখ লুকিয়ে কাজ করা সে বড় হেয় ব'লেই জানত।

সমী-র সে-সময়কার চেহারাটা আমার এখনও মনে পড়ে—বিশেষ ক'রে তার প্রতিভাদীপ্ত চোখ দুটো। কিন্তু তার সমস্ত প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যত আজগুবি খেয়ালে। পরীক্ষা পাশ করবার মত শক্তি তার যথেষ্ট ছিল; কিন্তু পরীক্ষার দিন যখন ঘনিয়ে এল, তখন পিতাকে জানালে যে, সে এক-রকম লেখাপড়া ছেড়ে দিতেই মনস্থ করেছে, সুতরাং—। সর্বেশ্বরবাবু হাঁ-না কিছুই বললেন না।

কলেজ ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু সমী-র একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। সেও তার পিতার মত একেবারে বই-এর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে ফেললে। সেই কয় বৎসরের নীরব সাধনায় তার ভিতরে যে জ্ঞানস্পৃহার আভাষ পাওয়া যেত, তা' যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে পূরণ হবার নয়, সে বোঝবার বয়স আমার তখনও হয়নি। তাই মনে করতাম, সমী নিজেকে একেবারেই নষ্ট ক'রে ফেললে।

এই সময়টাতে আমি তার কাছে মধ্যে মধ্যে যেতাম বটে; কিন্তু বিশেষ আমল পেতাম না।

তারপর কি থেকে কি হ'ল জানি না—একদিন শুনলাম সমী কাউকে কিছু না ব'লে কলিকাতা ছেড়ে চ'লে গেছে। খবরটাতে মন খারাপ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা শত তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও সমী-র উপর আমার একটা টান ছিল। সেটা প্রতিভার আকর্ষণ, কি মাতৃহীন স্নেহ-ক্ষুধিত হৃদয়ের উপর একটা মমতার ভাব—তা' ঠিক বুঝতে পারতাম না। সর্বেশ্বরবাবুকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা জানতাম; তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তরও লক্ষ্য ক'রলাম না।

পরে যখন শুনলাম, সমী লাহোরের একটা খবরের কাগজে

কাজ আরম্ভ ক'রেছে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হলাম বটে,—কিন্তু মন থেকে ক্ষুব্ধ অভিমানের ভাবটা একেবারে গেল না।

বৎসর কয়েক কাটবার পর পরপার থেকে সর্বেশ্বরবাবুর ডাক প'ড়ল। বুকের ক্রিয়াটা বন্ধ হ'য়ে যাবার সময় তিনি চেয়ারেই ব'সে ছিলেন এবং তাঁর আঙুলের মধ্যে একটা ধূমায়িত চুরুট তখনও ছিল। হাত থেকে যে বইখানা প'ড়ে গিয়েছিল, তার লেখককে কখনও আস্তিক্য দোষদুষ্ট বলতে পারা যায় না এবং তার পাঠকও যে ইদানীং সে দোষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছিলেন, সেটাও বেশ বোঝা গেল। সর্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে এতদিনে তাঁর সৃষ্টিকর্তার বিচারপড়া হয়ে গেছে কিনা জানি না—তবে তাঁর বিষয় নিয়ে পাড়ার কাউকে কখনো বিচার ক'রতে দিইনি এবং নিজেও করিনি।

লাহোরে চিঠি লিখে জানলাম—সমী বছর দুই হ'ল কি-একটা খেয়ালের ঝোঁকে সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে কেউ জানে না।

তার পিতার মৃত্যু-সংবাদ সমী খবরের কাগজ থেকেই পায়— সেটা জানা গেল মাসকতক পরে বোম্বাই থেকে তার একখানা চিঠি পেয়ে।

হাওড়াতে গাড়ী থেকে নেমেই সমী আমার দাড়ি ধ'রে বললে— সখি মণিমালিনী, তোমার যে এতবড় দাড়ি গজাবে, এমন তো কোন কথা ছিল না।

আমার নাম মণি বটে, কিন্তু আমার মধ্যে সখিত্ব এবং মালিনীত্ব খুঁজে বার ক'রতে একটু বিশেষ রকমের দৃষ্টিশক্তির আবশ্যক। তবে সমী-র মুখ থেকে যে "অমৃত হলাহলের মিশ্র গন্ধ"টা বেরোচ্ছিল, তাতেই যে তাকে অন্ধ করেছিল তা' নয়; সমী-র ধরণই ছিল ওই

রকম। আট বৎসর পরের প্রথম আলাপের আড়ষ্ট ভাবটা এইরূপ একটা হাল্‌কা পরিহাসে অনেকটা সহজ হ'য়ে এল।

বাড়ীর চাবি খুলে সমীকে সমস্তই বুঝিয়ে দিলাম। তার এই নূতন অধঃপতনের পরিচয় পেয়ে মনটা যে খুব প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল তা' নয়।

বাড়ী এসে স্ত্রীকে বললাম—সমী-র খাবারটা তাকে পাঠিয়েই দিও। সে বোধ হয় আসতে পারবে না, বড়ই ক্লান্ত।

মীরা শুনে একটুও বিচলিত হ'ল না। বললে, তারই বা দরকার কি? ওঁর সঙ্গে লোকজন আছে নিশ্চয়, নিজেই বন্দোবস্ত ক'রে নেবেন বোধ হয়।

নিছক অভিমানের কথা—তবে অভিমানটা আমার উপর কি সমী-র উপর, তা বুঝতে পারলাম না। বললাম, সেটা কি ভাল হবে?

স্ত্রীজাতি স্বামীর বাল্যবন্ধুদের উপর মনে মনে তুষ্টিভাব পোষণ করে না জানি; তবু এতটা তাচ্ছিল্য—

খাবার যথাসময়ে গিয়ে পৌঁছাল। মীরা আর কিছু উচ্চবাচ্য ক'রলে না।

তার পরদিন সমী-র বাড়ী গিয়ে দেখি, নীচেকার ঘরগুলা সব অন্ধকার। শুনলাম, সমী ছাদে আছে।

ছাদের উপর সতরঞ্চি পাতা। চীনেদের তৈরী দু'খানা আরাম-কেদারা—তার একখানায় সমী চুপ ক'রে শুয়ে আছে। পাশে একটা টিপয়, তার উপর অর্দ্ধশূন্য ডিক্যাণ্টার, পূর্ণ গ্লাস এবং প্রায়-শূন্য সিগারেট কেস্‌। একটা বৌলে কয়েকটা সযত্ন-রক্ষিত গোলাপ, আর তার নিচের থালায় একরাশ ছোট ফুল।

সেদিন যত পুরাণো কথাই হ'ল। পাড়ার চিরাচরিত জীবন-

যাত্রার কোন্ ফাঁকে কার ভণ্ডামি ধরা পড়েছিল, কার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের অবনতি ঘটেছিল, কার কীর্তিকলাপ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল—এই সব পরচর্চার মধ্যে সমী-র নিজের অতীত জীবনের কথাও বাদ যায়নি। সেই কবে কলেজ পালিয়ে ঘোড়-দৌড়ে যাওয়া এবং বাজি জিতে একটা ইংরাজী হোটেলে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত হৈ-চৈ করা—সে সব কথাও হ'ল। সমী জিজ্ঞাসা করলে. মণি, এখনও কি তোমার সে রকম ভয়-ভয় ভাব আছে?

এখনও মদ খাওয়া অভ্যাস করিনি শুনে, সমী ব'ললে—খুব ভাল। তবে একটা কথা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি না। তোমরা তো সকলেই ধর্মাত্মা মহাপুরুষ, কিন্তু তোমরা সব গলা চিরে, মাথা ধরিয়ে হাজার রকমের কসরৎ করে যে আনন্দটা পাও—যার তোমরাই নাম দিয়েছ কারণানন্দ—সেটা যদি দু'একগ্লাস সত্যিকারের কারণবারি পান ক'রে পাওয়া যায়, তাতে লাভ বৈ লোকসান কোথায়?

আমি কারণানন্দের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কাজেই কিছু উত্তর দিতে পারলাম না। সমীকে এটাও বলতে পারলাম না যে, সোমরস বলতে প্রাচীনেরা পাতা-চোয়ানো ভাঙ কিংবা ফুল-চোয়ানো মদ বুঝতেন। আমার বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ গবেষণা নেই শুনে সমী নিজেই মদের অনেক গুণ ব্যাখ্যা আরম্ভ ক'রলে।

এতক্ষণ সে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করছিল। একটু থেমে গ্লাসটি শূন্য করে জিজ্ঞাসা করলে—মণি, তুমি বিয়ে করেছ?

—ক'রেছি বৈ কি।

—কোথায়?

—লাহোরে। বিরাজ রায়ের মেয়েকে।

—বিরাজ বাবুর?—কোন্ মেয়ে?

—মেজ—মীরা—তুমি তাঁদের চিনতে নাকি?

সমী ততক্ষণ বৌলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে নাকে, মুখে, চোখে গোলাপের স্পর্শ অনুভব ক'রছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ব'ললে—ত্থাখ মণি, এ জিনিসটা—অর্থাৎ ফুলকে ছিঁড়ে চট্‌কে মট্‌কে ভোগ করাটা—একেবারে নিছক বর্বরতা। অথচ মানুষ ভোগ্য বস্তুর পীড়ন না ক'রে ভোগ ক'রতেই জানে না। তাতে ভোগ জিনিসটাকে একেবারে নর্দামায় টেনে আনা হয় এবং ভোগের অবসান না হয়ে ভোগেচ্ছাটা বেড়েই যায়।

—কিন্তু তা'তে যে মাদকতা আছে সেইটেই কি আসল ভোগ নয়?

—কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা? সেইখানেই তো যত গোল। এই গোলটার সমাধান না ক'রতে পেরে বেচারা ওমর খৈয়াম কতই না হা-হুতাশ ক'রে গেছে। সে জানত না যে, এর সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে – সংযম।

সমী-র মুখে সংযমের কথা! তখনও যে অর্ধ-শূন্য ডিক্যাণ্টার সামনে!

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বার ক'রে সমী ব'লতে লাগল—এই-খানেই আমাদের দেশের দার্শনিকেরা ইরান কবির উপর 'স্কোর' ক'রেছে। ভোগ ক'রতে হবে, কিন্তু নির্লিপ্ত হ'য়ে—অর্থাৎ ভোগ করবে প্রভুর মতন, কোন কিছুতে আসক্ত না হ'য়ে। এই যেমন প্রেম—সেটা ভোগ করা যায় তখনই, যখন প্রেমাস্পদকে নিজের ক'রে নেবার ইচ্ছার উপরে উঠতে পারা যায়। বৈষ্ণবদের মধুর ভাবটাও—

বাধা দিয়ে বললাম—অর্থাৎ ইহকাল পরকাল সমস্ত কালের ভোগের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে সংযম।

—ঠিক বুঝেছ মণি—।

—এবং সেই সংযম-সাধনার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে হুইস্কিযোগ, কেমন?

সমী হো-হো ক'রে হেসে উঠল। ব'ললে—দ্রাক্ষারস না হোক, অন্তত একটা রসও গ্রহণ করবার শক্তি তোমার ভিতর আছে দেখে আশান্বিত হ'লুম।

সে রাত্রে মীরাকে গিয়ে বললাম—কিন্তু মীরার কথা বলবার আগে সমী-র কথাটা একেবারেই শেষ করা ভাল।

সমী-র মদ খাওয়াটা পছন্দ করতাম না, কিন্তু তার কাছে না গিয়েও থাকতে পারতাম না—তার এমনই একটা আকর্ষণী ছিল।

তাকে প্রায়ই প্রথম দিনের অবস্থাতেই দেখতাম—সেটাই ছিল তার স্বাভাবিক অবস্থা ; তখন তার সঙ্গে অনেক রকম কথাই হ'ত। আবার এক-একদিন দেখতাম, একখানা বই নিয়ে এমন একাগ্র হয়ে আছে যাতে দুটো-একটা অন্যমনস্ক উত্তর ছাড়া কথার উত্তরই পেতাম না। উঠে আসতাম—তাও সে জানতে পারত কিনা সন্দেহ। আবার এক সময়ে এমন স্ফূর্তির ভাব দেখতাম, যাতে আমার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য কোথায় উড়ে যেত, তার ঠিকানা থাকত না ; সমীর জিভ্‌কে সে-দিন ঠেকিয়ে রাখাই ভার হত। আবার এক-একদিন দেখতাম, ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে, এমন বিষাদ-গম্ভীর, এমন একটা অবসাদের ভাব, যার জন্যে তাকে বেশী নাড়াচাড়া করতে সাহস হ'ত না।

এ-সব ভাবের আভাষ ছেলেবেলাতেই সমী-র চরিত্রে পাওয়া যেত ; এখন সেগুলো খুব বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে দেখলাম।

সমী-র মনের সাম্য-অবস্থাতেই তার সঙ্গে কথাবার্তা চলত ভাল। সে কত রকমের কথা ; আর সমী-র কথা বলবার ভঙ্গীই ছিল আলাদা। তার মতামতের এমন একটা অনন্যতন্ত্রতা ছিল, যা' এক-এক সময়ে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকলেও প্রাণের ভিতর একটা সাড়া না দিয়ে ছাড়ত না। তার আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, গম্ভীর বিষয়ের আলোচনার সময় যখন উদ্‌গ্রীব

হ'য়ে তার কথা শুনছি, তখন হঠাৎ অতর্কিতভাবে একটা হালকা আলোচনায় সে সমস্ত বিষয়টাকে একেবারে উঁচু থেকে নিচুতে নাবিয়ে দিত। ফলে, সমী যে কোথায় তাত্ত্বিক এবং কোথায় পরিহাসপরায়ণ, এটা বোঝা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং তার চেয়েও ধারালো পরিহাস-প্রবৃত্তি—এই দুটো নিয়ে খেলা করা সমী-র পক্ষে যত সহজ ছিল, সেগুলো ঠিক মত বোঝা আমার পক্ষে সেইরূপই কঠিন হ'ত। কিন্তু এ সমস্তেরই ভিতর দিয়ে তার যে ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুত, তার সামনে মাথা নত না ক'রে থাকতে পারা যেত না। আসলে, সমী তার প্রতিভাটা নষ্ট করছিল, এবং সেই নষ্ট করাতেই সে একটা তীব্র আমোদ পেত ;—বেদুইন যেমন নিজের উরুতে বর্শাফলক পূরে দিয়ে আনন্দ পায়—অনেকটা সেই রকম।

পাঞ্জাবের অনেক কথা সমী ব'লত—তার ঘর-মুখো বন্ধুর কাছে সেগুলো শোনাতো আরব্য উপন্যাসের মত। মনে হ'ত একাধিক সহস্র রজনীর অনেকগুলো রজনীর ইতিহাস যেন সমী-র গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।… ..মনের চক্ষে ভেসে উঠত লাহোরের এক-একটা চাঁদনি রাত। গ্রীষ্মে ছাদের উপর তরুণীর মেলা ; মল্লিকা ফুলের মত তাদের রং, সুতীক্ষ্ণ নাসা, সুতীব্র কটাক্ষ, আধ-আলো, আধ-ছায়ায় তাদের "কত কানাকানি" আর "মন জানাজানি।" ......শীতকালের দুপুরে সরু গলি-পথ খাটিয়া পেতে জুড়ে বসত যত সুন্দরী পুরনারী ; বিদেশী যুবকের সলজ্জ দৃষ্টি তাদের উপর এসে পড়ত ; পাশ দিয়ে একটু পথ খুঁজে নেবার চেষ্টায় তাদের বীণা-কণ্ঠে তরল হাস্য-লহরী খেলে যেত, আর তাদের সেই দুর্বোধ্য ভাষায় পরিহাস—এ সব কল্পকথার মতই মনে হত, এবং আমার প্রাণের ভিতরটা একটা ক্ষণিক চঞ্চলতায় অভিভূত হ'য়ে পড়ত।

……বুক উঁচু ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে রাতে লুকোচুরি খেলা, কাশ্মীরি ললনার আহ্বান দৃষ্টি, পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠি কন্যার ঈর্ষ্যা এবং তার পরিণতি—এ সমস্ত কথাই সমী নিঃসঙ্কোচে ব'লে যেত। প্রহসন যে কত সময় ট্র্যাজেডিতে পরিণত হ'তে-হ'তে রয়ে গিছল, তা' শুনে এক-এক সময় আমার বুকের রক্ত দ্রুত চলতে আরম্ভ ক'রত। এর ভিতরে ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির কথা মনেই উঠত না; সমী-র বলবার ভঙ্গিতে সমস্ত জিনিসটা যেন একটা হাল্‌কা ছেলেমানুষি ব্যাপার ব'লেই মনে হ'ত।

কল্পকথার পাঞ্জাব বোদগাদি·আবহাওয়ার সূক্ষ্ম বোর্‌কায় আবৃত হ'য়ে আমার কাছে দেখা দিত। সমী ব'লত—সে আবহাওয়ার একটা নেশা আছে, একেবারে চেপে ধরে। কিন্তু সে নেশা কাটতেও সময় লাগে না বেশী।

—কি রকম?

—কোমল নারী-কণ্ঠে "সাডা" "তোয়াডা" শুনলেই ও নেশাটা ছুটে যায়। ওদের মাতৃভাষাটা পুরুষদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকা উচিত, মেয়েদের জন্য উর্দ্দুর ব্যবস্থা করাই ভাল। কিন্তু কেই বা করবে? আর্যসমাজ আগাগোড়া হিন্দি চালাবার পক্ষপাতী। মন্দ নয়, উর্দ্দুর মত না হ'লেও পাঞ্জাবী ভাষার চেয়ে ঢের বেশী শ্রুতিমধুর।

পাঞ্জাবী আবহাওয়ার নেশায় সমী আরও ব'লত—ওটা শ্যাম্পেনের নেশার মত—একেবারে মাথায় চ'ড়ে যায়—ইতর মস্তিষ্কে সহ্য হয় না; কিপলিংএর অবস্থা হয়। কিপ্‌লিংএর প্রতিভা অসাধারণ, সেটা অস্বীকার করবার যো নেই; তার ভিতর যদি অভিজাত কাল্‌চারের প্রভাব থাকত, তাহলে সে একটা বড় আর্টিষ্ট হ'তে পারতও বা। কিন্তু উঁচু জাতের ইংরেজ সে ছিল না;

তাই নেশায় ডুবে সে যা রত্ন তুলেছে, তার সঙ্গে সম্মাকর্ষণী শক্তিতে উঠে এসেছে অনেকটা কাদা ও পাঁক।······আসল পাঞ্জাবকে যদি কেউ এঁকে দেখাতে পারত, তো সে বলেন্দ্র ঠাকুর। তার অসমাপ্ত লাহোরচিত্রের খসড়া দেখলেই তা' বোঝা যায়।

এই কথা থেকে চিত্রকলা-পদ্ধতির কথা উঠল। পাঞ্জাবে আদৃত কাংড়া পদ্ধতিতে আঁকা নারীর মুখে যে কোমল লাবণ্যের ভাব আছে, তা' কোন দেশের কোন শিল্পীই অনুকরণ ক'রতে পারেনি। আশ্চর্য কিন্তু, ও-দেশের নারীর মুখে আর্য তীক্ষ্ণতার ভাবটাই বেশী পরিস্ফুট।

সমী ব'ললে—ওইখানেই আদর্শ আর বাস্তবের সঙ্গে যত বিবাদ। আসল শিল্প তো প্রকৃতির নকল ক'রে তৃপ্তি পায় না। সে একটা নূতন কিছু সৃষ্টি করতে চায় এবং সেই নূতনত্বটাই কালে প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে হয়। এই হিসাবে আদর্শটাই সত্য, সেটা real না হ'লেও সত্য, আর প্রকৃতিই অনুকরণকারী, শিল্পী নয়; শিল্পী সৃজনকর্তা।

আমি একটু কুণ্ঠিতভাবে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অস্বাভাবিকত্বের দিকে সমী-র দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

সমী একটু উত্তেজিত হয়েই ব'লতে লাগল—কিন্তু এ অস্বাভাবিকত্বের ধারণাটা এল কোত্থেকে? কুশিক্ষাটা হচ্ছে একেবারে গোড়াকারই গলদ। ধ্যানে যে মূর্তি ফুটে ওঠে, দর্শনে তা' মনে একটা বিশেষ ভাব জাগিয়ে তোলে, তখন কোথায় থাকে অস্থিসংস্থানের জ্ঞান, আর পরিপ্রেক্ষণের খোঁজ? সে খোঁজটা যখন আসে তখন সৌন্দর্য-ভোগটা একেবারেই শেষ হয়ে গেছে জেনো।

এই থেকে স্বভাবতই রাস্কিন-স্থাপিত pre-raphelite brotherhoodএর পরিণামের কথা উঠল এবং সেই সূত্রেই য়ুরোপের আদর্শ

এবং বাস্তব—দুই রকম শিল্পেরই বিকাশ ও পরিণতি বিষয়ে সমী অনেক কথা বলেছিল মনে আছে; কিন্তু সে সব কথা তুলে আজ আর কথা বাড়াবার দরকার বোধ করি না।

পরিশেষে সমী ব'ললে—একটা কথা মনে রেখো, মণি! সেটা হচ্ছে অধিকারী-ভেদ। উচ্চাঙ্গের শিল্প সকলের জন্য নয়। ইতরের জন্য রবিবর্মাই ব্যবস্থা।

তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ললে—আমার নিজের মতামত ছেড়ে দিলেও তোমরা যে বাস্তব-বাস্তব কর, বাস্তবিক ক'টা লোক তোমাদের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত? তোমরা যে ছবিতে লতানে আঙুলের আপত্তি কর, আমি যে তা' নিজের চক্ষে দেখেছি।

—কোথায়?

—লাহোরে—সবজি-মণ্ডির একটা ড্রেনের ধারে।

প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে গেলাম, তারপর সমী বুঝিয়ে দেবার পর ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল।

সমী একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে ওই রকম তিনটি আঙুল দেখেছিল—কোনও সুন্দরীর হাত থেকে যেন অতর্কিতে অস্ত্র দিয়ে কাটা। একটি আঙুলে আংটীর পাতলা কালো দাগটি তখনও ছিল।

সমী ব'ললে—আমি অবশ্য পুলিশে খবর দিইনি। নিজেই খোঁজ নেওয়া শুরু করলুম।

শিল্পের কথা ভুলে গিয়ে গল্পের কথায় মেতে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

—তারপর আর কি—চেষ্টাটা ছেড়ে দিতে হ'ল একটা বেনামী চিঠি পেয়ে। স্ত্রী-হস্তের লেখা চিঠি। তাতে ছিল—আপনার প্রতি অনুনয়, ব্যাপারটা এইখানেই শেষ করুন যদি এক পুরমহিলার সম্ভ্রমের উপর আপনার এতটুকুও শ্রদ্ধা থাকে।

—চিঠিটা পেয়ে তুমি একটুও বিচলিত হ'লে না ?

—হ'তুম, যদি সেদিন তার চেয়েও একটা গুরুতর কাজে না ব্যস্ত থাকতুম।

গল্পটা শুনে আমি নিজে একটু বিচলিত হয়েছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করলাম—এর চেয়েও কি গুরুতর কাজ থাকতে পারে তোমার ?

—একটা ফরসী তৈরী ক'রতে দিয়েছিলুম, তার আওয়াজের পরখ করতেই অর্ধেকটা দিন কেটে গেল।

বন্ধু সমী-র এই পরিচয়ই যথেষ্ট বোধ হয়।

২

সমীকে প্রথম দিনে নিজের বাড়িতে এনে না খাওয়ানোতে মীরার উক্তিটা অভিমান-সঞ্জাত ব'লেই মনে হয়েছিল এবং তাতে একটু খুসীও হয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মীরার স্বাভাবিক ঔদাসীন্যের কথা মনে পড়ল, তখন তার মধ্যে খুসী হবার কোন কারণই আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মীরার কাছে একদিন সমী-র মদ খাওয়ার কথাটা ব'লেই ফেললাম —অতর্কিতে নয়, ইচ্ছা ক'রেই। সমী-র সে অবস্থায় তাকে আমার বাড়িতে না আনাটা যে শুধু মীরার আত্ম-সম্মানটা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই, তা জেনে মীরা খুসী হয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু মুখভাবে তার এতটুকুও আভাষ পাওয়া গেল না।

আমার এবং মীরার সম্পর্কের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল ওইটুকুই।

স্ত্রীর কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে আমার মস্তিষ্ক চালনা করতে হ'ত কম নয়; স্ত্রীও ছিল সব বিষয়ে আমার একান্ত অনুগত;—কিন্তু তার

দেহমনে এমন একটা ঔদাসীন্য দেখা যেত, যা সাধারণ স্বামীর পক্ষে সহ্য করা একরূপ অসম্ভব ছিল। এমন কি মাঝে মাঝে আমার পক্ষেও সেটা পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠত।

আসলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার ঠিক পরিচয় হয় নাই ; মীরাকে আমি চিনি নাই এবং চেনবার কখনো চেষ্টাও করি নাই। আজ রোগশয্যা থেকে উঠে জীবনের যে নূতনত্বের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিতে হচ্ছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নূতন হচ্ছে এই জ্ঞানটাই। স্মৃতির শ্লেট থেকে পুরাতন জীবনের হিজি-বিজি লেখাগুলো একেবারে মুছে ফেলে, নূতন ক'রে আবার লেখা আরম্ভ ক'রতে হবে, এবং সেটা না ক'রলে ভবিষ্যৎ জীবনটা যে আগের মত স্বস্তিতে কাটবে না—অন্তত সে বিশ্বাসটা আমার বদ্ধমূল হয়েছে। এইটুকুই আমার পক্ষে লাভ। স্ত্রীর সঙ্গে আমার নূতন ক'রে পরিচয় ক'রে নিতেই হবে, যদিও—

সমস্যাটা এইখানেই। মীরার চরিত্রে একটু অসাধারণত্ব ছিল। শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্ত্রী-চরিত্র পুরুষের ভাগ্যের মতই দুর্জ্ঞেয়। কোন্ এক বিদেশী লেখকের কেতাবে পড়েছি, স্ত্রী-চরিত্র অর্ধেকটা ছেলে-মানুষি এবং অর্ধেকটা সয়তানী দিয়ে তৈরি। সমী ব'লত—ওর কোনটাই ঠিক নয়। তার মতে—স্ত্রী-চরিত্র তাদেরই কাছে দুর্জ্ঞেয়, যারা স্ত্রীলোকের ভিতর মানবীকে খোঁজে না ; খোঁজে হয় দেবীকে, নয় দানবীকে। তারা যে পুরুষেরই মত রক্তমাংস গঠিত মানুষ, এ কথাটা মনে রাখলেই আর কোন গোল থাকে না।

হয়ত এটা ঠিক হতে পারে। এটা কিন্তু ঠিক যে আমি মীরাকে ওরূপ কোন চক্ষেই দেখিনি। তাকে দেখতাম, কতকটা সহধর্মিণী এবং কতকটা অনুগত দাসীর ভাবে। এটা খাঁটি সত্য কথা। অন্য সময় হয়ত নিজের কাছেও এ কথাটা স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হতাম। কিন্তু আজ যখন ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া ক'রে নিতে

হচ্ছে, তখন যে আর ভাবের ঘরে ফাঁকি রাখা চলবে না—সেটা বেশ বুঝেছি। অন্তরের মণিকোঠায় যে রত্নটি একান্ত যতনে রক্ষিত ছিল ব'লে মনে করতাম, এখন তার অস্তিত্ব নিয়েই তো যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ হয়েছে।

আমার স্ত্রী ছিল আমার গৃহিণী, ক্বচিৎ সচিব, ক্বচিৎ প্রিয়শিষ্যা, কিন্তু সে আমার সখী তো কোনদিনই ছিল না। অজ-বিলাপের ছন্দের মধ্য দিয়ে যে ইন্দুমতীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাকে কখনো শরীরী প্রণয়িণী ব'লে মনে করি নাই, রাজ-অন্তঃপুরের রাণী ব'লেও নয় ;—তাকে জানতাম কবির কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণহীন ছন্দমূর্তি ব'লেই এবং আমার নিজের স্ত্রীর ভিতরে তার আভাষ কখনও পেতে চেষ্টা করি নাই।

ভুল একটা হ'য়ে গেছে এবং সেটা শোধরাতে হবে। জীবন-খাতার শেষ পাতাটায় যখন শান্তি-বচন লিখব, তখন যেন সঙ্কীর্ণতার চাপে আমার হাত আড়ষ্ট হ'য়ে না আসে, তখন যেন মুক্তপ্রাণে সত্য কথাটাই লিখে যেতে পারি।

সেই সত্য কথাটারই আভাষ দিতে আজ চেষ্টা ক'রব—যদিও সেটা আভাষ মাত্র।

* * * *

মীরাকে যখন বিবাহ করি, তখন আদালতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল। বিবাহ ক'রেছিলাম নিজে দেখে শুনেই—তবে সেটা নিতান্তই নিয়ম রক্ষার্থে। বিবাহটা ঠিক ক'রেছিলেন দু'পক্ষের অভিভাবকগণ এবং একটা পাকাপাকি কথা হ'য়ে যাবার পর দিন-কতকের জন্য আমরা একটু আলাপের অবসর পেয়েছিলাম মাত্র।

প্রথম পরিচয়েই মীরার দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম ; কিন্তু সেটা যে তার রূপের জন্য—তা' ঠিক নয়। মীরার চেয়েও অনেক

রূপবতী মহিলার দর্শন-সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার ভাগ্যে ঘটেছিল এবং তাদের কাহারও রূপ আমার মনের ফলকে একটা বিশেষ কিছু আঁকতে পারেনি।

আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার গুণপনায়—অন্তত তার গুণপনার কথা শুনে। তার পিতৃমাতৃ উভয় কুলেই বিদ্যাচর্চাটা খুবই ছিল এবং মীরার নিজের বিদূষী না হলেও উচ্চ-শিক্ষিতা ব'লে পরিচয় ছিল।

তাই প্রথম আলাপের দিন কথা খুঁজে না পেয়ে একান্ত সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—আপনি ব্যর্গসঁ প'ড়েছেন কি?

ব্যর্গসঁর সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নূতন হয়েছে এবং ব্যর্গসঁর সঙ্গে যে বিশ্বের সকলেরই পরিচিত হ'তে হবে, এ বিশ্বাস এমন-কি আমারও ছিল না। তবু মনে ভাবলাম—ভাবী বধূর সঙ্গে প্রথম আলাপটা যদি ব্যর্গসঁর কেতাবের আড়ালেই হ'য়ে যায়, তাতে বিশেষ আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে? ও ব্যাপারটার ভিতরে যে একটা হাস্যরসের উপাদান ছিল, সেটা আমার তখন মনেই ওঠে নি।

কিন্তু মীরা যখন অবনতমুখে জানালে যে ব্যর্গসঁর সঙ্গে তার পরিচয় নেই, তখন একটু আশ্বস্ত হ'লাম—এই ভেবে যে অন্তত আমার কাছ থেকে আমার ভাবী বধূর শেখবার অনেক কিছু আছে। কথাবার্তার এই প্রথম সুযোগে ব্যর্গসঁর ব্যাখ্যা আরম্ভ করবার প্রলোভন সামলাতে পারলাম না। ব'ললাম—আমি সম্প্রতি ব্যর্গসঁর নূতন থিওরিটা নিয়ে আলোচনা ক'রছি;—আচ্ছা আপনার কি মনে হয়—তাঁর মতে হাস্যরস ও বুদ্ধি এই দুটো আপাত-নিঃসম্পর্কিত হ'লেও—

এমন সময় মীরার বড়দিদি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং তারপর থেকে কথাবার্তাটা চায়ের মতই তরলাকার ধারণ ক'রলে। নিতান্ত যে দুঃখিত হয়েছিলাম, তা' নয়।

পরদিন গিয়ে দেখি, মীরা একখানা বই-এর পাতা উল্টোচ্ছে।

মনে মনে খুসী হলাম—নিশ্চয়ই বইখানা ব্যর্গসঁর লেখা, আমারি সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে মীরা হয়ত ওটা পড়ে রাখছে।

উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কি প'ড়ছেন?

—একখানা রান্নার বই, নতুন বেরিয়েছে।

অনেকটা হতাশ হ'য়ে ব'ললাম—তা' বেশ; ওটা খুব ভাল।

—কোন্‌টা? রান্নাটা না পড়াটা?

একটু অপ্রতিভভাবে উত্তর ক'রলাম—রান্নার বইটা।

মীরা অম্লানবদনে জিজ্ঞাসা ক'রলে—ব্যর্গসঁর চেয়েও?

মীরার পরিহাসে একটু বিরক্ত হ'লাম। সে ভাবটা চেপে একটু হালকা স্বরেই ব'ললাম—কিন্তু ব্যর্গসঁকেও তো খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

—ঠিক কথা। সেইজন্যেই বইখানা প'ড়ে রাখছি।

মীরার প্রকৃতির এই লঘু দিকটার পরিচয় পেয়েও আমি নিরুৎসাহ হইনি। জানতাম, বিবাহ হ'লে আমার উপদেশ এবং উদাহরণে ও-সব দূর হ'য়ে যাবে।

বিবাহের পূর্বদিন পর্যন্ত মীরাকে 'আপনি' ব'লেই সম্বোধন ক'রতাম। যে আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, সেখানে নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমটা একেবারে অস্থি-মজ্জাগত হয়ে গিছ্‌ল। মীরাকে একদিন অতর্কিতে 'তুমি' সম্বোধন ক'রে ক্ষমা চাইবার সুযোগ পেয়ে যে আত্মপ্রসাদটা অনুভব ক'রেছিলাম, সেটা এই ভেবে যে মীরা অন্তত জানুক যে, তার ভাবী স্বামী তাকে কতটা সম্ভ্রমের চোখে দ্যাখে।

সেদিন মীরার বড়দিদি ওই কথা নিয়ে অত্যধিক স্নেহে আমার যথেষ্ট সুখ্যাতি ক'রেছিলেন; ব'লেছিলেন—দেখুন, সাধারণ স্বামী-স্ত্রী 'তুমি' সম্বোধন ক'রে থাকে, কিন্তু পল্লীগ্রামে ইতর জাতের স্ত্রীরা স্বামীকে 'আপনি' সম্বোধন করা ভদ্রানুমোদিত মনে করে। আমার মনে হয়, আপনার মত মার্জিত-রুচি লোকেরা যদি আমাদের সমাজে

ঠিক তার উল্টো প্রথাটার অর্থাৎ স্বামীর স্ত্রীকে 'আপনি' সম্বোধন করাটা প্রচলন করেন, তাহলে বড় মন্দ হয় না।

কথাটা ঠিক পরিহাসব্যঞ্জক কি না, সেদিন বুঝতে পারিনি। তাঁর মুখে ছিল গাম্ভীর্য, কিন্তু চোখে ছিল হাসি।

ফুলশয্যার রাত্রে মীরার রূপ প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলে। রূপে যে কতটা মাদকতা থাকতে পারে, আমার জীবনে সেই প্রথম অনুভব ক'রলাম। লজ্জার লালিমা, কালো চোখের স্থির কটাক্ষ, সর্বশরীরের একটা মদালস ভাব—আমাকেও চুম্বনাকুল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু মনে মনে ভগবানের কাছে বল প্রার্থনা ক'রলাম। আজ যদি চপলতা প্রকাশ করি, তাহলে জীবনে স্ত্রীর কাছে আর সম্ভ্রম পাবার অধিকারী হ'তে পারব না। সংসার পথের যাত্রা আমাদের আজ থেকে সুরু হ'ল, আজ কি সুলভ চাপল্যে বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে আছে?

স্থিরকণ্ঠে ডাকলাম—মীরা!

কোনও উত্তর পেলাম না!

দু'একবার বৃথা চেষ্টা ক'রে বললাম—মীরা, শোন। আমরা উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিক্ষিত।...তোমার এরকম লজ্জা শোভা পায় না—বিশেষত যখন দুজনেই দুজনের সঙ্গে পূর্ব হ'তেই পরিচিত। ...অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহের গুরুত্ব না বুঝতে পারে, কিন্তু আমাদের সেটা বুঝে নেওয়া উচিত। আমাদের জীবন যে আজ কত দায়িত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, সেই কথাটাই আমি তোমাকে বোঝাতে চাই।

মীরা উঠে ব'সল। তার আর লজ্জাবগুণ্ঠন ছিল না। দেখলাম, তার মুখ মার্বেল পাথরের মত ফ্যাকাশে এবং তারই মত কঠিন হয়ে গেছে। মূর্খ আমি, সেদিনকার তার মনোভাব কিছুই বুঝিনি। তার

প্রথমকার লজ্জা নারীসুলভ coyness ব'লেই মনে হয়েছিল এবং এখনকার ভাবের শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিকটাই বেশী ক'রে নজরে প'ড়ল।

সে রাত্রে মীরাকে সাংসারিক জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য সব বুঝিয়ে দিলাম—বিশেষ ক'রে স্ত্রীর কর্তব্যগুলো। পরিশেষে ব'ললাম—এমনি ক'রে জীবনযাপন ক'রলে তুমিও সুখী হবে আমিও সুখী হব এবং আমাদের উভয়ের সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ স্বর্গ থেকে আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ ক'রবেন।

তারপর উপদেশগুলোকে একটু নরম করবার জন্য হাল্‌কা সুরে ব'ললাম—ত্থাখ, বিবাহিত জীবনের প্রথমেই রাত্রি-জাগরণে আমরা স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রলাম। আর নয়, তুমি এবার ঘুমোও, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে।

মীরা এতক্ষণ প্রস্তর-কঠিন মুখে, নিমেষহীন চোখে আমার দিকে চেয়েছিল। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে শয্যাগ্রহণ ক'রলে।

হায়, তখন বুঝিনি—উদ্ভিন্ন যৌবনের আকাঙ্ক্ষাটা শুধু শাস্ত্রবচন উচ্চারণে এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনেই তৃপ্ত হয় না। ঘুমিয়ে সেটা রসহীন এবং উপদেশে সেটা তিক্ত হ'য়ে ওঠে মাত্র। সমী শুনলে নিশ্চয় ব'লত—মূর্খ, বাসর-রাত্রি জীবনে শুধু একবারই আসে!

এমনি ক'রেই আমাদের বিবাহিত জীবন আরম্ভ হ'ল।

সে জীবনে বৈচিত্র্য কিছু ছিল না, অতএব বলবার বিশেষ কিছুই নাই।

মীরা আমার একান্ত অনুগত ছিল। ফুলশয্যার রাত্রির উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রত, কোন দিন এতটুকুও ত্রুটি হয়নি। সংসারের সমস্ত কাজ ঘড়ির কাঁটার মতই চলত! কোথাও এতটুকু ফাঁক দেখা যেত না।

সব চেয়ে বেশী সুখ বোধ ক'রতাম—মুখে যাই বলি না কেন—মীরার আনুগত্যে। কোন বিষয়ে মীরার স্বতন্ত্র মতামত ছিল না, যদিও কথায় কথায় তাকে মনে করিয়ে দিতাম যে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আমার একেবারেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু তাকে আমার মনোভাবের সঙ্গে এমন ক'রে জড়িয়ে নিয়েছিলাম যে, আমার চোখ এবং আমার বুদ্ধি দিয়েই সে সমস্ত জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হ'তে এতটুকুও আপত্তি ক'রত না। এমন হয়েছে, মীরার পোষাকী জুতো ছিঁড়ে গেছে; সুয়েডের বদলে স্বদেশীর দোহাই দিয়ে বাদামি রংএর শক্ত ক্রোম এনে দিয়েছি, মীরা তাই প'রেই নিমন্ত্রণে গেছে, বন্ধুদের পরিহাস এবং পায়ের ক্ষত অম্লানবদনে সহ্য ক'রে বাড়ী ফিরে এসেছে। তার ব্লাউসের কাপড় এবং সাড়ীর রং পছন্দ ক'রে দিতাম আমি। তার ফলটা এক-এক সময় এমন দাঁড়াতো যে, আমি নিজেই অপ্রতিভ হ'য়ে পড়তাম; কিন্তু মীরা কোনোদিন একটি কথাও বলেনি।

বিবাহের পূর্বে মীরার প্রকৃতিতে যে একটু তারল্য ছিল, বিবাহের পরে সেটা একবারে অদৃশ্য হ'য়ে গিছল; তাকে যেন সে মীরা ব'লে চিনতেই পারা যেত না।

কিন্তু এই আনুগত্যভাবের সঙ্গে যে কতটা পরিমাণে ঔদাসীন্য মিশানো ছিল, তা' তখন বুঝতে পারিনি। বোঝবার উপাদান আমার খুব কাছেই ছিল, কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি কোনদিনই পড়েনি। আমি ছিলাম অন্ধ, এবং সর্বোপরি আত্মসর্বস্ব।

একটা ঘটনা—যেটাকে তখন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব'লেই ভেবেছিলাম—সেটার পর থেকেই এই ঔদাসীন্যটা যেন একটু বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল।

শীত কেটে গিয়ে সেদিন প্রথম বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। কাছারি থেকে ফিরে এই বারান্দাতেই মাদুর পেতে ব'সেছিলাম। অলিন্দের

ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রকিরণ এসে প'ড়েছিল। ছায়ার সঙ্গে জ্যোৎস্না মিশিয়ে যে কুহকী মায়াজাল রচনা ক'রেছিল, মনে হচ্ছিল, আমাকেও সে তার জালে জড়িয়ে নেবে হয়ত।···ভাবছিলাম একটা মোকদ্দমার কথা—নথীটা সেই রাত্রেই দেখে শেষ করতে হবে—এমন সময় দখিন হাওয়ার একটা হিল্লোলের সঙ্গে মীরা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এই দ্বিতীয়বার—যেদিন মীরার রূপের দিকে আমার নয়ন আকৃষ্ট হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রির সেই মদালস ভাব ; কিন্তু তার সঙ্গে আজ সেদিনের সেই অজানা লাজের গোপন বাধা মাখানো ছিল না ;—চুলে জড়ানো ছিল নবমল্লিকার মালা, পরিধানবস্ত্রে ছিল বিদেশী ফুলের গন্ধ, আর চোখে ছিল সে কী দীপ্ত-চাহনি! বিবাহ হ'য়ে গেছে এই কয়েক মাস—কিন্তু এ চাহনি মীরার চোখে আমি পূর্বে কখনও দেখিনি।... সে একেবারে আমার গা ঘেঁসে ব'সল, তারপর কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার অছিলায় মুখ তুলে চাইলে। মুখের এত কাছে মুখ নিয়ে এসেছিল, আজও যেন মনে হয় তার পাৎলা ঠোঁটের উপর পানের লাল দাগটি দেখতে পাচ্ছি।······ভয় হ'ল, সে রাত্রে আর আমার নথী পড়াটা শেষ হবে না। স'রে ব'সে ব্যস্ত হয়ে ব'ললাম—মীরা, একটা আলো নিয়ে এস, আর আমার চাপকানের পকেটে সেই নথীটা—

মীরা উঠে দাঁড়াল, তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে অতি ধীরে বেরিয়ে গেল।

আলো নিয়ে যখন ফিরল, তখন তার মুখে সেই সেদিনের শান্ত কঠিন ভাব। মনে মনে মীরার ইচ্ছাশক্তির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলাম না। এই ত আমার উপযুক্ত স্ত্রী।......তারপর নথীতে মনোনিবেশ ক'রলাম।

তখন বুঝিনি, সেই রাত্রের নিষ্ফলতার সঙ্গে আমার জীবনের

সমস্ত বসন্ত রাতগুলোকে একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিলাম। নবীন-বসন্তে সাকী এসেছিল যৌবনের সুরায় রূপের পাত্র পূর্ণ ক'রে,—মূঢ় আমি, অধরে না ছুঁইয়েই তা' ফিরিয়ে দিলাম। যদি জানতাম যে সেই প্রত্যাখ্যানের ফলে একদিন এই জীবনের শুষ্ক পাত্রখানা চোখের জলে এবং বুকের রক্তে ভরিয়ে নিতে হবে, তাহলে কি—

কিন্তু তখন সে কথা ভাববার সময় ছিল না। একটা নিতান্ত সস্তা-দরের আত্মপ্রসাদে মোহিত হয়েছিলাম। আমার মত স্ত্রী-ভাগ্য কয়জনের আছে? কর্মনিষ্ঠ, ধীর, স্থির, গম্ভীর, আমার স্ত্রীর ভিতরে বাচালতা বা চাপল্যের লেশমাত্রও ছিল না।

তবুও অস্বীকার ক'রতে পারব না—আমার পুরুষ-হৃদয় মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠত মীরার ঔদাসীন্যে। রাত্রির নিবিড়তার সঙ্গে মিলনেচ্ছা যখন সুনিবিড় হ'য়ে আসত, তখনও মীরার কাছ থেকে কোনদিন সাড়া পাইনি; চুম্বনে মাদকতা ছিল না, নিশ্বাসে আবেগ ছিল না, বুকের রক্ত দ্রুততালে চলত না। নিখিল বিশ্বের যে সুর সৃজনের তালে ধ্বনিত হচ্ছে, তার প্রতিধ্বনি মীরার ভিতরে কখনও পাইনি।

ভিতরের পুরুষটি ব'লত—এ তো ঠিক নয়, কোথায় যেন কিছু গলদ আছে। বাহিরের আত্মপ্রসাদ-পুষ্ট মাষ্টারমশায়টি ব'লত—এই ত ঠিক। এমন স্ত্রী-ভাগ্য কয়জনের আছে?

•

সমী আসার পর থেকেই কিন্তু মীরার ভিতরে একটা সাড়া প'ড়ল। প্রথমটা সমীর বিষয়েও তার ঔদাসীন্যে আমি একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কেননা আমার বাল্য-বন্ধু সমী-র উপর যে টানটা ছিল—সত্য কথা বলতে কি—আমার স্ত্রীর উপর ততটা ছিল না। তার কারণ এটা হ'তে পারে যে, স্ত্রীর উপর আমার যে স্বত্ব-স্বামীত্ব ছিল, বন্ধুর উপর

তা' ছিল না এবং স্ত্রীর ভালবাসার বিষয়ে যতটা নিশ্চিন্ত ছিলাম, খেয়ালী বন্ধুটির বিষয়ে তার সিকিব সিকিও নয়।

সমী-র প্রতিভার কি আকর্ষণ ছিল—তার কথা মীরাকে যতই ব'লতে আরম্ভ ক'রলাম, ততই তার ঔৎসুক্য আগেকার ঔদাসীন্যকে ছাপিয়ে যেতে লাগল। সমী-র সব কথা তাকে অবশ্য বলতাম না, সে নিজে থেকেও কিছু জিজ্ঞাসা ক'রত না; কিন্তু যেটুকু ব'লতাম, সেটুকু সে উদ্‌গ্রীব হ'য়েই শুনত।

সমী-র কাছে ঘন-ঘন যাওয়াতে প্রথমটা মীরা একটু আপত্তি ক'রেছিল—বিবাহিত জীবনে আমার কার্যে সেই তার প্রথম মতামত প্রকাশ। সমী-র কাছে যাবার জন্যে বেরুচ্ছি, এমন সময় মীরা আমার কাঁধে হাত রেখে ব'ললে—তুমি ওখানে অত বেশী নাই গেলে।

—কেন, ভয় করে নাকি?

—তা' নয়।

—তবে?

—তোমার বন্ধুর দার্শনিক মতকে ভয় করি।

—তার মদকে নয়?

—না; কেননা সেটা খেলেও তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে না জানি; কিন্তু তার দার্শনিক তত্ত্ব তোমার সহ্য হবে না।

—কেন?

—সকলকার কি সব জিনিস সহ্য হয়? তার চেয়ে তুমি আবার নতুন ক'রে ব্যর্গসঁ পড়া আরম্ভ কর—সেই ভাল।

ব্যর্গসঁর কথায় আমার বিশেষ আপত্তি ছিল। সে অপ্রীতিকর স্মৃতিটা মীরার তোলবার কোন দরকার ছিল না। কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে আমি সমী-র বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম।

সমী-র সে-দিনের ভাবটা ছিল বেশ একটু স্ফূর্তি-মাখানো। মীরার আপত্তির কথা শুনে প্রথমটা সে হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারলে না। জিজ্ঞাসা ক'রলে—তোমার স্ত্রী তার কোনও মতামত তোমার স্কন্ধে চাপাতে চায় নাকি?

ব'ললাম—তা' নয়, বরং তার বিপরীত। তারপরে মীরার ঔদাসীন্যের কথা সাধারণভাবে সমী-র গোচর করলাম। বিশেষ ক'রে একটা ঘটনা সম্প্রতি আমায় পীড়া দিয়েছিল সেটার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না। মাড়োয়ারী মক্কেলের মোকদ্দমা জিতে প্রাপ্যের চেয়েও অতিরিক্ত অনেকটা টাকা পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে নিজে পছন্দ ক'রে মীরার জন্যে কি একটা গহনা কিনে এনেছিলাম। কিন্তু সেটা যে মীরার পরা উচিত—অন্তত স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্যে——এ কথাটা তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল। স্বরটা আমার একটুও কর্কশ হয় নাই, কেননা ক্রোধ জিনিসটাকে একরূপ জয় ক'রেছিলাম ব'ললেই হয়—কিন্তু মনটা একটু তিক্ত হ'য়ে গিছল।

সমী শুনে ব'ললে—স্ত্রীর উপর যদি মাঝে-মাঝে একটু রাগ কর, তা'হলে বোধ হয় মন্দ না হ'য়ে ভালই হয়।

ব'ললাম—তা' কি ক'রে হতে পারে? সে আমায় ভালবাসে এবং আমিও যে তাকে না ভালবাসি তাতো নয়।

সমী অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলে—সে বিষয়ে কি তুমি স্থির-নিশ্চিত?

কথাটা ইংরাজীর তর্জমা; অন্যমনস্ক হ'লে সমী-র কথাবার্তায় ইংরাজীর ভাগটা প্রায় পুরাপুরিই থাকত।

ব'ললাম—আমার বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আসলে মীরার বিষয়েও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি তাকে বুঝতে পারতাম না বটে, কিন্তু তার ভালবাসাকে আমি

স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধ'রে নিয়েছিলাম। বিবাহিত স্ত্রীর যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে, তা' আমার ধারণার অতীত ছিল। স্ত্রী কি কখন স্বামীকে না ভালবেসে থাকতে পারে ;— বিশেষত যে স্বামী তার কোন অভাব রাখেনি, কখন রূঢ় ব্যবহার করেনি এবং যার চরিত্র ছিল অনেক স্বামীর আদর্শ এবং অনুকরণীয় !

সমী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল ; তারপর ধীরে ধীরে ব'ললে—ছাখ মণি, যে জিনিসটা পাবার উপযুক্ত, সেটা অর্জন ক'রতে হয় এবং যদি সেটা রাখবার উপযুক্ত ব'লে মনে হয়, তা'হলে তাকে প্রতিদিনই নূতন ভাবে অর্জন ক'রে নিতে হয়।

কথাটা সমী ইংরাজীতেই ব'ললে, তাইতে বুঝলাম সমী অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছে। সেদিন আর গল্প জমাবার সম্ভাবনা নেই দেখে বাড়ী ফিরে এলাম।

সমী-র কথাটা কিন্তু আমার প্রাণের তারে ঘা দিয়েছিল। মনে ক'রলাম, মীরাকে এমন ক'রে আমার সঙ্গ-সুখ থেকে বঞ্চিত করা উচিত হয় না।

তার পরদিন সন্ধ্যায় মীরাকে ছাদে ডেকে পাঠালাম। মীরা জিজ্ঞাসা ক'রলে—আজ আর বন্ধুর কাছে যাবে না ?

—না, আজকে তোমার কাছেই সন্ধ্যাটা কাটাব মনে ক'রেছি।

—সে বেচারা একলা থাকবে ?

—তুমিই বা কোন্ দোক্‌লা থাকবে ?

মীরা ব'সল, কিন্তু আড়ষ্ট হ'য়ে। ব'ললে—আমার এখন অনেক কাজ বাকী আছে। রাত্রির খাবার—

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিনে বেলা ক'রে খাওয়া হ'ত। খাবার পর বিশ্রাম। দিবা-নিদ্রা থেকে উঠে দেখতাম, মীরা তখনও

বৈকালিক জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। বিশেষ ক রে ছুটির দিনে তার এতটুকু বিশ্রামের অবসর থাকত না। এটা সব সময় আমার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রত না—আমার নিজের কাজেই এত ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু আজ মীরার কথা শুনে তার বিশ্রামহীন কর্ম-বহুল দিনগুলোর কথা মনে পড়ল। অনুতপ্ত হ'য়ে ব'ললাম—মীরা, তোমার খাটুনি তো রোজই আছে। আজকে একটু বিশ্রাম নিলে হয় না? আর এইবার থেকে একটু কম খাটলেও চলে নাকি?

—কিন্তু আমি না ক'রলে কে ক'রবে?

সত্যই তো। কাজ তো প'ড়ে থাকতে পারে না। আর মীরা ছাড়া কেই-বা তা' ক'রবে?

চুপ ক'রে রইলাম। মীরা একটু সান্ত্বনার স্বরে ব'ললে—তুমি তোমার বন্ধুর কাছেই যাও আজ। আমি ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে নি।

সমী-র কাছে যাওয়াতে ইদানীং মীরা আর আপত্তি তুলত না, বরং নিজে থেকেই আমাকে পাঠিয়ে দিত সেখানে। আমার উপর মীরার বিশ্বাসটা অটুট ছিল এবং আমার নিঃসঙ্গ বন্ধুটির উপরেও বিতৃষ্ণ ভাবটা চ'লে গিয়ে একটা মমতার ভাব ধীরে ধীরে মীরার প্রাণে জেগে উঠছিল; অন্তত আমার ধারণাটা তাই ছিল এবং তাতে আমি সুখী বই অসুখী হইনি।

কিন্তু সমীকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবার কথায় মীরা যখন আপত্তি তুললে, তখন একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। সমী যাই বলুক না কেন, স্ত্রী-চরিত্র বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়। মীরার জীবনের একটা সত্যকার সুখ ছিল পরিজনবর্গের সেবা করা—বিশেষ ক'রে তাদের খাওয়ানো। এতে তার ক্লান্তি ছিল না। সেই মীরাই সমীকে খাওয়াবার কথায় ব'লে ব'সল—আমি অত আয়োজন ক'রে উঠতে পারব না।

—কিন্তু আয়োজনটা কী এত বেশী হবে? তুমি ত জান সমী-র খাওয়ার বিষয়ে কোন হাঙ্গাম নেই।

মীরার অনিচ্ছা দেখে আর বেশী জোর ক'রলাম না। কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে ব'ললাম—আচ্ছা মীরা, তোমরাও তো লাহোরে ছিলে—সমী-র সঙ্গে আলাপ হয়নি সেখানে?

—ওকে কে না জানত?……তোমার খাবার জলে কি একটা প'ড়েছে—এই ব'লে জলের গ্লাসটা হাতে নিয়ে মীরা বেরিয়ে গেল।

সেদিন আর কোন কথাই হ'ল না।

পূর্বেই বলেছি, সমী-র আকর্ষণেই আমি তার কাছে যেতাম। সে আমার বাড়ীতে বড়-একটা আসত না। কোন দিন বেড়াতে যাবার খেয়াল হ'লে আমার বাইরের ঘরে উঁকি মেরে যেত, কচিৎ তার সঙ্গে আমার বেড়াতে যাবার সুবিধা হ'ত।

একদিন সমীকে টেনে নিয়ে একেবারে উপরে শোবার ঘরে গিয়ে উঠলাম।—সেদিন মীরা কোথায় নিমন্ত্রণে গিছল। ঘরে ঢুকে সমী-র দৃষ্টি প্রথম পড়ল আমাদের বিবাহের ছবির উপর, তারপর প'ড়ল মীরার চুল বাঁধবার টেবিলের আর্শির সামনে একগুচ্ছ গোলাপ ফুল ছিল—তারি উপর।

ফুলগুলোকে একটু নাড়াচাড়া ক'রে সমী হাসতে হাসতে ব'ললে—মণি, তোমার ঘরে এ ফুল কেন?

—কেন নয়?

—জানই ত, গোলাপ ফুলের রং তৈরী হয় হৃদয়-ছ্যাঁচা রক্ত দিয়ে। তোমার তো সে সব বালাই কিছু নেই।……

—তাতো জানতাম না।

সমী ব'লে যেতে লাগল—কিন্তু রক্তটা যে-সে লোকের হ'লে চ'লবে না—যারা দুঃখটাকে রাজা-রাজড়ার মত ভোগ ক'রতে পারে

একেবারে একলা হ'য়ে, রক্তটা তাদেরই বুকের হওয়া চাই। যাদের দীর্ঘ-নিশ্বাসটা জমাট বেঁধে তাজ-মহল তৈরী হয়—শুধু তাদেরই—বুঝলে?

বুঝলাম তো সবই। তবে এটা মনে প'ড়ল যে, মীরা ঠিক ওই কথাই একদিন ব'লেছিল—বোধ হয় কোন কবিতার বই-এ পড়ে থাকবে—এবং ঠিক ওই কারণেই সে গোলাপ ফুল ভালবাসত।

সমীকে তাই বললাম; সে কোন উচ্চ-বাচ্য করলে না। তাকে কিন্তু সেদিন বেশীক্ষণ ধ'রে রাখতে পারা গেল না।

মীরা ফিরে এসে সমী-র কথা শুনে কি একটা পরিহাস করলে, যাতে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। সমীর কাছে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রলাম—তার ভিতর কি ছিল, যাতে আমার নির্বাক প্রণয়িণীর মুখেও আজ কথা ফুটে উঠল—অতি সহজে এবং অতিশয় অনুরাগে।

হায়, এরূপ ভাবেই যদি চ'লত, তা'হলে জীবন-পথের যাত্রাটা ধীরে-ধীরে অতর্কিতে সহজ হ'য়ে আসত—আক্ষেপের কারণ থাকত না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ এবং—

পাড়ায় দেখা দিলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। প্রথম গুটিকতক রোগীকে সৎকার ক'রে এসে আমায় নিজেই শয্যা-গ্রহণ ক'রতে হ'ল।

সমী ইদানীং ব'লত—চ'লে যাব; পথের ডাক এসেছে; এক-ঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না।

তার যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল।

শিয়রে ব'সে থাকত আমার বাল্যবন্ধু, পায়ের কাছে ব'সে থাকত আমার স্ত্রী। তাদের দু'জনের মধ্যে ঔষধ-পথ্য ছাড়া আর কোন কথাই হ'ত না; কিন্তু যমের সঙ্গে যুদ্ধে যে শক্তিটা প্রয়োগ করা হচ্ছিল, সেটা উভয়েরই সমবেত শক্তি।

নিঃসঙ্কোচে সমী আমার বাড়ীর ভিতর আসত এবং কার্য শেষ ক'রে নিঃশব্দেই চ'লে যেত।

জ্বরটা ছেড়ে যাবার পর বিনিদ্র মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেবার জন্ম ডাক্তার ঘুমের ওষুধের ব্যবস্থা ক'রলে একদিন। ব'ললে—আর ভয় নেই, বিপদটা কেটে গেছে।

মীরার নিশ্বাসটা সেদিন সহজভাবে প'ড়ল। সমী ব'ললে—আমার তা'হলে আজ থেকে ছুটি।

ঘুমের ওষুধে নিদ্রাটা যে গভীর হয়, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ঘুমের ওষুধ কখনো ব্যবহার করেন নি। সে একটা অবস্থা—শরীরটা যাতে অসাড় হ'য়ে যায়, কিন্তু মন কতকটা সজাগ থাকে। স্বপ্নও নয়, জাগরণও নয়, নিদ্রাও নয়—অথচ এই তিনটের মিশ্রণ-জাত একটা অবস্থা।

সেই অবস্থায় মীরার কণ্ঠস্বর কানে গেল—যেন কোন্ সুদূর স্বপ্নরাজ্যের পরপার থেকে সে সমীকে ব'লছে—তুমি কেন এলে আবার?

—ঠিক যে তোমাকে দেখতে এসেছিলুম, তা' নয়।—সমী-র শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বরটাও মনে হ'ল অনেক দূর থেকে আসছে—অতি ক্ষীণ হ'য়ে।

মীরা ব'ললে—তা' জানি। তবুও—

—এর মধ্যে 'তবুও' কিছু নেই। জানতুম না যে, তোমার সঙ্গে মণির বিবাহ হ'য়েছে। জানলেও যে আসতুম না, তা' নয়।

—এতটুকুও দ্বিধা হ'ত না?

—কিছু মাত্র নয়। তোমার বিষয়ে আমার মন সম্পূর্ণ মুক্ত। ...আগাগোড়াই তাই ছিল।

তারপর একটু থেমে ব'ললে—আর যাই কর মীরা, বিবাহিত

জীবনে ভাবুকতা জিনিসটাকে প্রশ্রয় দিও না। সেন্টিমেণ্টালিটি বস্তুটা নিতান্তই সস্তা—ওটা নেহাৎ ইতর মনের খোরাক।

সমী-র কণ্ঠস্বরটা কি নিষ্ঠুর! কি কঠিন আঘাত না সে মীরাকে দিল! আমার কিন্তু করবার কিছুই ছিল না—দেহ একেবারেই নিঃস্পন্দ, অবশ!

মীরা কোনও উত্তর দিলে না। সমী তখন কণ্ঠস্বরকে একটু কোমল ক'রে নিয়ে ব'ললে—আমি সবই জানি, মীরা। তুমি যে কতবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছ, তা'ও আমার অজানা নেই। আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখো, সফল হবে।...অন্ততঃ এইটুকু মনে রেখো যে আমার অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে জড়িয়ে প'ড়লে তুমি এর চেয়ে বেশী অসুখী হ'তে।...লাহোরে সে রাত্রির কথা মনে আছে তো?

সমী উঠে দাঁড়াল।

মীরা হতাশ নয়নে তার দিকে চাইলে—তুমি কি সত্যই চ'লে যাবে?

—কিছুদিন আগেই তো যাচ্ছিলুম।

—কোথায়?

—তোমার জেনে কোনও লাভ নেই।

দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে সমী ব'ললে—সংসার-ধর্মটা যখন মাথা পেতে নিয়েছ, তখন সেইটেই ভাল ক'রে পালন কোরো। পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলোকে ভাবের রং-এ ছুপিয়ে নিও—সুখী হতে পারবে।

তারপর সমী চ'লে গেল। মনশ্চক্ষে দেখলুম, খাটের পায়া ধ'রে মীরা ব'সে আছে;—দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ, মনের কোনও সাড়া নেই।

মীরার উপর আঘাতটা খুবই কঠিন হয়েছিল, কিন্তু সমী নিজেকেও তো বাদ দেয়নি। যাকে ভালবাসত, তাকে আগাগোড়া বাঁচিয়ে এসেছে—নিজের কাছ থেকে। আর আজ? বন্ধুর জন্য, হয়ত বা মীরার জন্যও, পুরাতন ক্ষতের বাঁধনটা নিষ্ঠুর হাতে খুলে ফেলেছে। মীরাকে নিজের মনোভাব এতটুকুও জানতে দেয়নি—সে তাকে ভুল বুঝে যেন সুখী হয়, এই মনে ক'রে।

নিজের উপর সে যা আঘাত ক'রলে, তার গুরুত্বটা সেও হয়ত কোন কালে বুঝবে না।······

আর মীরা?······হায় অভিমানিনী, তুমি যে পশরা মাথায় ক'রে আমার কাছে এসেছিলে, তার দুর্লভতা যে কত, তা' একেবারেই বুঝিনি। স্বামীর চরণে সর্বস্ব দিয়ে তাহারি ভালবাসার প্রলেপে হৃদয়-ক্ষতটা মুছে নিতে চেয়েছিলে, মূঢ় অর্বাচীন আমি, তা' তো কিছুই জানি নাই, অকর্মণ্য হাতের অস্ত্র-প্রয়োগে ক্ষতটাকে বিষিয়ে তুলে-ছিলাম মাত্র।···আজ শুনতে পাচ্ছি—বর্ষার দিনে, বসন্তের রাতে, তোমার প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার, বুঝতে পাচ্ছি—প্রতি মুহূর্তে হৃদয়-যুদ্ধে জয়ী হবার সে কি ব্যর্থ চেষ্টা···

মনে মনে ব'ললাম—তোমায় জয়ী হ'তে সাহায্য ক'রব, মীরা!··

তারপর মাথার ভিতর দিয়ে একটা রেখার ঢেউ খেলে গেল—সমস্ত সৃষ্টি—স্বপ্ন ও বাস্তব—এক-সঙ্গে সেই রেখাসমুদ্রে ডুবে গেল।···

আমি বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লাম।

* * *

তার পরদিন ডাক্তার এসে জানালে—আমি রোগমুক্ত। তার কাছ থেকেই শুনলাম যে সমী-কেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধ'রেছে এবং তাকে হাঁসপাতালে পাঠানো হ'য়েছে।

দু'দিন কোন খবর নিতে পারিনি। তৃতীয় দিনে একটা কথা শুনে মীরাকে সন্ধ্যাবেলায় ব'ললাম—সমা হাঁসপাতালে নেই, কোথায় গেছে কেউ জানে না। যে লোক খবর আনতে গিছল, তাকে কে যেন ব'লেছে—সব শেষ হয়ে গেছে হয়ত।

আমার দুর্বল হৃদয়ে সংবাদটা একরূপ অসহ্যই হ'য়েছিল; মীরা কিন্তু এতটুকুও চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রলে না; এক-মনে আমার পথ্যের ব্যবস্থা ক'রতে লাগল—পূর্বের মতই।

এই কি সেই স্বপ্ন-রজনীর মীরা? যা হারিয়েছে, তার জন্য এতটুকুও খেদ নাই? ক্ষুব্ধ মনটা আবার তিক্ত হ'য়ে গেল।...

কিন্তু তিক্ত ভাবটা বেশীক্ষণ রইল না।..

রাত্রে জেগে দেখি, মীরা পাশে নাই। আলো জ্বেলে দেখলাম, বিছানার এক কোণে মীরা উপুড় হ'য়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বেচারি মীরা! ভুল বুঝে কি অবিচারটাই না তার উপর ক'রেছি। মমতায় প্রাণটা পূর্ণ হ'য়ে গেল।...

মীরার পাশে ব'সে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত রাখলাম। মীরা কোন কথা না ক'য়ে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ প'ড়ে রইল।... তারপর উঠে ব'সে আমার দিকে চাইলে। দেখলাম—তার চক্ষু অশ্রুহীন, মুখ প্রস্তর-কঠিন।...তার হাত আমার হাতের ভিতর তখনও ছিল...

খুব শান্তভাবেই ব'ললে—তুমি শোও। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।

* * * *

আজ রোগমুক্ত হ'য়ে আরাম-কেদারায় শুয়ে ভাবছি..... সে কথা ত পূর্বেই ব'লেছি।

নিশীথে

উঃ কি ঠাণ্ডাই না পড়েছে, হুজুর! এই পাঞ্জাবী শীত—এ যেন বেহস্তের হুরার চাউনির মত। একেবারে কলিজার ভিতর অবধি বিঁধে দিয়ে যায়।...আরে কম্‌বক্‌ত, ও আঙ্গুটীর আগুন কতক্ষণ জ্বলবে? চিমনিতে কাঠ নিয়ে এসে জ্বেলে দে। জানিস না হুজুরকে আজ সারারাতই দফ্‌তরে কাটাতে হবে। আর আমাকেও। হুজুরের খিদ্‌মদ্‌ করবার জন্তে।—ঘুমিয়ে নয়, বেআকুফ্‌।...লয়লার তস্‌বিরের মত তুই যে হাঁ ক'রে চেয়েই রইলি...এই নবীবক্‌স্‌, হুজুর, বড়ই বে-আক্কেল। ও আবার দফ্‌তরি হতে চায় এত বড় আখ্‌বরের আপিসে।...আরে, তুই চিরটা কাল কাপিবয় হয়েই থাকবি আর দরকার মাফিক চিমনিতে আগুন জ্বেলে দিবি। বুঝলি? সদরে রায়সাহেবের কুঠি খুঁজে বার করতে তোর ঘণ্টাভোর লেগে যায়। দিনে তিনবার হুজুরের চিঠ্‌ নিয়ে তুই যাবি কি ক'রে? তুই হবি দফ্‌তরি?...না, হুজুর, বেআদফি মাফ্‌ করবেন। আমি এই চুপ করলাম।......

আজ ভোর রাততক্‌ কাজ হবে। বিলায়ৎ থেকে তার্‌ আসবে আর হুজুর তার ওপর যা তহরীর লিখবেন তা হবে একেবারে আংরেজি কেতাবের মত। হুজুরের এলেম দেখে লাট সাহেবের তাক্‌ লেগে যাবে আর হুজুরকে তিনি কৌন্‌শিলে ডেকে হানারেবল্‌ ক'রে দেবেন। একথা আমি বলে রাখছি, হুজুর,—আমি নুর মহম্মদ—আমার মুখ দিয়ে ঝুটবাৎ বেরোয় না। ওয়াঃ...গুস্তাকহি মাফ্‌ করবেন, হুজুর। আদালত ছাড়া আর কোথাও মিথ্যা জবান

বলা আমার অভ্যেস নেই। তানৈলে কি এখানে দফ্‌তরিগিরিতে বহাল হতে পারি?...সবাই বলে এ আখ্‌বরকে ছোটলাট অবধি ভয় ক'রে চলেন—গরমের সময় কবে তাঁর পাহাড় যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যায়! সেদিন দিত্তামল বলছিল—হুজুরের এক তহরীরের জন্ম লাটসাহেবের কাছে সিমলা পাহাড় থেকে কৈফিয়তের তলব এসেছে।...হুজুর, দিত্তামল ঠিক বাৎই বলেছে এবার। তবে সওদা করবার সময় ও বড় ঝুট বলে। বেনিয়া কিনা। তা' নইলে ও বলে বেড়ায় ওর মেয়ের উমর বারো বছর, যখন মহল্লার সবাই জানে যে সে ষোল বছর পার হয়ে গেছে আর জিওয়ানরামের ছেলে হর্‌কিষণের সঙ্গে ...না হুজুর, এ মুখ দিয়ে আর ও-কথা বেরোবে না। কে-ই বা দিত্তামল্? একটা বেনিয়া বৈ ত নয়। তার অন্দরের কথায় আমাদের কাজ কি? ...হুজুর, আমি এই চুপ ক'রলাম।...

...মাফ্‌ ফরমাস ক'রবেন, হুজুর, কিন্তু ও নামটা হর্‌বক্‌ত শুনে আসছি—হরেক রকম লোকের মুখে। হুজুর কি তার কথা আখ্‌বরে লিখছেন? আল্লা হুজুরের কলমে হজ্‌রত্‌ আলির তলওয়ারের জোর দিন্! শহরের দুশমন্ হচ্ছে ওই মুসাহিব খাঁ। বাজারে সবাই তাই বলে। ও যার নাতি, সে ছিল মজিঠিয়া সর্দারদের বাগানের মালি। ওর বাবা আংরেজের খয়েরখাঁগিরি ক'রে কুর্সীনশীন্ হয়ে গেল্। কতদিনের কথাই বা? আর দু'পাত আংরেজি পড়ে আর একবার বিলায়ৎ ঘুরে এসে ওর খেতাব হ'ল কিনা "মিয়াঁ"! আর এখন কৌন্‌শিলে ঢুকে হানারেব্‌ল্ হয়ে দেশের দুশ্‌মনি করছে।...আল্লা কশম্, বান্দা এইবার চুপ ক'রল। হুজুর এত নারাজ হবেন জানলে—হুজুরের জুতোর শুকতলা আমি—আমি কি মুখ খুলতে সাহস করি? চিড়িয়াখানার ভাল্লুর মত

আমি এবার ওই চিম্‌নির ধারে গিয়ে বসে থাকব—একেবারে মুখ বন্ধ ক'রে।…

…ওয়াঃ, হুজুরের লেখা এত জল্‌দি শেষ হয়ে যাবে কে জান্‌ত। জিব্রেইলের পাখনার মত হুজুরের কলম উড়ে চলে।… আরে নবিবক্‌স্, এটা নিয়ে যা'। আর জিওয়ারামকে বল্—জলদি এর প্রুফ টেনে দেবে।…হুজুর ততক্ষণ আগুনের ধারে আরাম কেদারায় তস্‌রিফ্ রাখবেন আর আমাকে খানিকক্ষণের জন্য ছুটি দেবেন।…

…হাঃ, হাঃ, হুজুর কিনা জানেন? ঝুট বলে কি জাহান্নমে যাব? এই শীতের রাত্তিরে একটু সরাব না হলে চলে না। সত্যিই। তবে যোয়ান বয়সে খেতাম না, হুজুর। আমায় সরাব ধরালে সেই শয়তানী।…না, হুজুর, ঝুটবাৎ নয়…আওরাৎ জাতটাই হচ্ছে ইব্‌লিশের বাঁদী। দুনিয়ার যত কিছু শয়তানী আর দুশ্‌মনি—তার পিছনে আছে আওরাৎ।…কি ফরমায়েস করলেন হুজুর? প্রুফটা এলেই বাকি রাতটা আমার একে-বারেই ছুটি? আমার উপর হুজুরের বহুৎ মেহেরবাণী। আল্লা আপনার চুলের ফাঁকে ফাঁকে আরও চুল গজিয়ে দিন!…ওহে জিওয়ারাম, প্রুফটা টানতে যেন দেরী না হয়। হুজুরের চোখের ওপর ঘুম-পরীর পাখনার হাওয়া এসে লাগছে। জলদি ক'রে হাতটা চালিয়ে নাও।… হাঁ হুজুর, ততক্ষণ সেই শয়তানীর কেচ্ছাটা ব'লব। সে বেঁচে থাকতে আমার জিন্দগিটা বরবাদ ক'রে দিয়েছিল আর কবরে গিয়েও আমার জাহান্নমে জলবার জন্যে লকড়ি জোগাড় ক'রে রেখে গেছে।…তাকেই এড়াবার জন্যে জওয়ার সিংএর জুয়ার আড্ডায় গিয়ে মিশি আর সরাব খাওয়া সুরু করি। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে, রোজই খেতে হয়। রাত-বিরেতে সেখানে সরাবও

পাওয়া যায় আর দু'চার পয়সা লেন্‌দেন্‌ও হয়।…না, হুজুর, সে আপনার যাবার মত জায়গা নয়। দিত্তামলের দোকানের পিছনে মৌলাবক্‌সের হাম্মাম আছে—তারি চৌবাচ্চার ভিতরকার এক দরওয়াজা দিয়ে জওয়ার সিংএর আড্ডায় যাওয়া যায়।… পুলিস? পুলিস কাপ্তান সাহেব যে না জানে তা' নয়। কিন্তু ধরা বড় শক্ত, হুজুর। জওয়ার সিং বড় হুঁসিয়ার আদ্‌মি।…আগুনটা একটু খুঁচিয়ে দি? তারপর গল্পটা বলি।…আরে নবিবক্‌স্, বাজারে কি চোখের জলে সওদা হয়? কাঠগুলো এত ভিজে কেন?… আমি জানি, হুজুর কেচ্ছাটা শুনে তারিফ করবেন আর দরাজ হাতে বক্‌শিস্ দেবেন। আমি তো হুজুরের পোষা কুকুর। আল্লা রায় সাহেবের মন ফিরিয়ে দিন আর শীগ্‌গিরই তাঁর লড়কির সঙ্গে হুজুরের সাদি…না নাঃ হুজুর, এইবার কেচ্ছাটা সুরু ক'রব। বয়স হয়েছে, একটু বেশী কথা কয়ে ফেলি। তবে সাদির সময় খিদ্‌মদ্‌গারি ভুলবেন না হুজুর।…

আমিও বাঙ্গালী, হুজুর। ঢাকা জেলায় ফিরোজসাহী পরগণায় আমার পয়দা হয়েছিল।…হুজুর কি ক'রেই বা বুঝবেন বলুন। যত মাহিয়ানা হুজুর এখানে এসেছেন তার চেয়েও বেশী বছর আমার এই পাঞ্জাবে কেটেছে। উর্দ্দু জবানটা একেবারে দুরস্ত হয়ে গেছে। প্রথম যখন এলাম—এখানকার মুসলমানরা আমায় কাফের বলে উড়িয়ে দিত—উর্দ্দু কইতে পারতাম না বলে। কি বে-আক্কেল আদমি সব! আরে, মক্কাশরীফে কি উর্দ্দু জবান্ চলে? খোদার দরবারে কি উর্দ্দুতে জবাবদিহি ক'রতে হয়? তা' তারা বুঝত না। যাই হোক্, এখন আমি তাদের চেয়ে ভাল উর্দ্দু বলি—একটু এলেম ছিল কিনা, তাই। হুজুরের তাইতেই ধাঁধা লেগেছিল আর কি—তা' নইলে হুজুর না জানেন কি?…যা বলছিলাম। দেশে কিছু

জমিজরাত্ ছিল। একরকম সুখে দুঃখে কেটে যেত। নসীবন ছিল আমার ফুফেরি বহিন্। তার সঙ্গে আমার সাদি হবার এক-রকম সব ঠিক্ঠাক হয়ে গিছল। আমাদের মধ্যে আসনাই ছিল অনেকদিন ধরে। কি খাপসুরৎ ছিল সে! এই পায়জামাপরা আওরাতের দেশে তার জোড়া আজতক্ চোখে পড়েনি। নীল রঙের শাড়ী পরে সে যখন খালের ধারে জল আনতে যেত—তখন আমি থাকতাম তেঁতুল গাছতলায় দাঁড়িয়ে। তার আড়চোখের চাউনিতে বিঁধে দিয়ে সে চলে যেত। বেশিক্ষণের জন্য নয়। তখনই জল নিয়ে ফিরত আর সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কত কথাই হ'ত তার ঠিকানা নেই। বেশিক্ষণ তার কাছে থাকলে তার রূপের জলুশে মগজটা চন্মন্ ক'রে উঠত আর বুকটা মনে হ'ত যেন ভেঙে পড়বে।

এই রূপটাই হ'ল তার কাল। আর আমারও। তার সঙ্গে এতদিনের আস্নাই—তবু এক এক সময় বুঝতে পারতাম না—তার মনটা আমার উপর সত্যিই ছিল কি না। চাউনিটা ঘুরে বেড়াত অনেকেরই মুখের উপর—স্থির হ'ত কেবল এক আয়নার উপর। সেইটেই ছিল তার সব চেয়ে পেয়ারের জিনিস। মিঠে জবান্ আর সুর্মা-পরা চোখের চাউনি সে গাঁয়ের সকল ছোকরাকেই সমানে ভাগ ক'রে দিত। তবে আমি যতক্ষণ তার কাছে থাকতাম—সে যে আমারই—এ বিশ্বাসটা আমার মধ্যে গেঁথে যেত। ছেলে-বেলা থেকে এক সাথে মানুষ হয়েছিলাম—একটা টান তার আমার উপর ছিল নিশ্চয়ই। সেটা আর কারুর উপর ছিল না। তবে তার সমস্ত মনটা সে কখনো আমাকে দিয়েছিল কিনা—তা এক খোদাই বলতে পারতেন। তাকে জিগেস ক'রলে সে হেসে আমার গলা জড়িয়ে আদর করতে সুরু ক'রে দিত।

আমাদের জমিদার বাবু প্রায় কোলকাতাতেই থাকতেন। সেবার পূজোর পরবের সময় দেশে ফিরলেন। ছোকরা বয়স—শিকার খেলতে ভালবাসতেন। একদিন গাঁয়ের কাছে বিকেলের দিকে তাঁকে দেখলাম—বন্দুকের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নসীবনের সঙ্গে কথা কইছেন। আমি সেলাম ক'রে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। আমার দিকে চোখ পড়তেই কিন্তু নসীবনের মুখের রংটা বদলে গেল। একটু বাদেই তিনি চলে গেলেন। আমার মনটা একটু বিগড়ে গিয়েছিল। বাড়ী ফেরবার পথে নসীবনকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিলাম। কিন্তু সে ছিল অন্য-মনস্ক। কথা বোধ হয় কানেই গেল না। কার উপর যে গোসা করছি—তা' তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছি, হুজুর—জিন্দগিটা রূপের আলোয় পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে। তাকে বড়ই পেয়ার করতাম—কি ক'রেই বা বুঝব যে তার মনের ভিতরটা ছিল একেবারেই ফাঁকা—পরের কথার সুরে সে সেই ফাঁকটা ভরিয়ে দিত আব পরের চোখের রোস্‌নিতে তার রূপটা ঝালিয়ে নিত। সে শুধু নিতেই জানত—দিতে জানত না।...এখন মনে হয়, তার দেবার ছিলই বা কতটুকু!

সে বছরটা মনে আছে, হুজুর?—সেই যেবার সরকারের হুকুমে বাংলা দেশটা দু'ভাগ হয়ে গেল? কিসে যে কি হ'ল বুঝলাম না, কিন্তু এটা ঠিক মালুম হয়ে গেল যে, হিন্দুরা আমাদের দুষমন্‌। "লাল ইস্তাহার" হাতে হাতে ফিরতে লাগল আর মোল্লাদের গলার আওয়াজে আমাদের মগজটা গেল একেবারে বিগড়ে। হিন্দুদের সঙ্গে চিরটা কাল এক চালাতে ওঠাবসা করেছি, দাদা, খুড়ো, মাসী, দিদি সম্পর্ক পাতিয়েছি—সে সব গেলাম ভুলে।... তারপর যে কাণ্ডটা সুরু হ'ল তাতো হুজুর সবই জানেন। কত মন্দির

ভেঙে পড়ল, কত মেয়ে বেইজ্জৎ হ'ল, কত ভিটে লুট হ'ল—তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই।···গাঁয়ের কাজ খতম হবার পর হুকুম হ'ল কুমিল্লা লুঠ ক'রতে হবে। মাথায় খুন চেপে গিছল। চল্লাম।

কুমিল্লায় গিয়ে কিন্তু চমক ভাঙল। সেখানকার হিঁদুরা খবর পেয়ে তৈরী ছিল। আর তাদের ছোকরাদের লাঠির বহর দেখে আমাদের নেশা গেল ছুটে, সেখান থেকে সরে পড়তে হ'ল। ফিরে এসে যা দেখলাম···নবিবকস্, ওরে শয়তানের চিড়িয়াখানার ঝাড়ুদার, ওঠ্, আগুনটা যে নিবে এল—চিমনীতে আরও কাঠ দিতে হবে না? কামরাটা যে আনারকলির কবরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।···

হুজুর, দেশে ফিরে যা দেখলাম, তাতে কলিজার রক্ত একেবারে জল হয়ে গেল। বাড়ী-ঘর-দোরের নিশানা অবধি নেই। শুনলাম—জমিদার বাবু দেশে ফিরে এক রাত্তিরের মধ্যে মুসলমান প্রজাদের বাড়ী-ঘর হাতী দিয়ে জমিসাৎ ক'রে দিয়েছেন। দেখলাম ভিটের ওপর রাতারাতি কলাগাছ বোনা হয়ে গেছে। দলের সব কে কোথায় গেছে ঠিকানা নেই। যাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, পুলিশ তাদের ধ'রে সদরে চালান দিচ্ছে। আমিও ধরা পড়লাম।

এতদিন নসীবনের কথা মনেই ছিল না। হাজতে গিয়ে প্রথম তার কথা শুনলাম।

অনেকে অনেক রকম ব'লছিল। কিন্তু তার চাচা বুড়ো কাদের বক্স যা' ব'ললে তাই ঠিক ব'লে মালুম হ'ল। সে নিজের চোখে দেখেছে—কাছারীর লোকেরা তাকে জুলুম ক'রে জমিদারের বাগান-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পুরেছে, অন্য কোন রকম বেইজ্জৎ করে নি।··· ভালবাসা এক আজব চিজ্, হুজুর। শেরকে শয়ের ক'রে তোলে।

দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভুলে গিয়ে এখন কেবল নসীবনের কথাই মনে আসতে লাগল।…সে না জানি আমার জন্যে কতই ছট্‌ফট্‌ ক'রছে। তার নসীবে কি আছে মনে ক'রে অস্থির হয়ে উঠলাম।…হিঁদু মেয়েদের বেইজ্জতের কথা মনে পড়ল।…নসীব এমনি ক'রেই কথা কয় হুজুর।…পিঁজ্‌রে-পোরা বাঘের মত আমার দশা হ'য়ে উঠল।…

একদিন অনেক রাত্তিরে কয়েদিদের মধ্যে কি একটা কথা নিয়ে আপনা-আপনিই তকরার বেঁধে গেল। হাজতের লোকেরা এসে মিট্‌মাট্‌ করবার ফাঁকে আমি বেরিয়ে পড়লাম।…সে এই রকমই এক রাত্তির হুজুর—হাড়-কাঁপানো শীত আর টিপির-টিপির বৃষ্টি।… সেখান থেকে জমিদারের বাগান-বাড়ী সাত ক্রোশেরও উপর। খাল, বিল, নালা, মাঠ পার হ'য়ে—কখনো সাঁতরে, কখনো দৌড়ে, একটুও না জিরিয়ে যখন বা'র বাড়ীর ফটকে পৌঁছলাম তখন প্রায় শেষ রাত্তির। গায়ে কাপড় ছিল না—কিন্তু শীত একটুও লাগেনি। গা মাথা কাঁটা আর রক্ততে ভরা। সে সব তখন খেয়াল ছিল না।…

বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। হল-ঘবটা ছিল অন্ধকার। পাশের ছোট কামরাটায় আলো জ্বলছিল। অন্ধকারে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম একবার। দাঙ্গার সময় এত মাথা ফাটিয়েছি যে, বাবু জমিদার হ'লেও তাঁর মাথাটা ফাটিয়ে দেওয়া কিছুই ভাবনার কথা ছিল না। তবুও একটু ভাবনা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে নসীবনের কথা মনে পড়ল। বাইরে রেলিং থেকে যে লোহার শিকটা খুলে এনেছিলাম সেইটে ভাল ক'রে বাগিয়ে ধরলাম। তারপর দরজার আরো কাছে এগিয়ে গেলাম।…সমস্তই চোখে পড়ল তখন। জমিদার বাবুর সামনে খালি গেলাস—নেশা তখন পুরো মাত্রায়—তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ব'সে আছেন আর তাঁর গলা জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুয়ে—

বসে আছে নসীবন।···নসীবনের গলার আওয়াজ কানে গেল—সে নেশার আওয়াজ নয়, তবু যেন গলাটা একটু ভাঙা ভাঙা ঠেকল।···এর মধ্যেই এত পোষ মেনে গেল সে? প্রথমটা বুঝে উঠতেই পারলাম না। বড় তাজ্জব লাগল।···লোহার শিকটা হাতেই ছিল কিন্তু নসীবনের কথা যতই শুনতে লাগলাম আমার মুঠির জোর ততই কমে আসতে লাগল।···কি শুনলাম তা' আল্লাই জানেন। তবে তাঁরই দোআয় এটুকু বুঝলাম যে, নসীবনকে জোর ক'রে ধ'রে আনা হয়নি। জমিদার বাবুর সঙ্গে তার কোল্‌কাতায় যাওয়া অনেক আগেই—দাঙ্গাহাঙ্গামারও আগে ঠিক হ'য়ে গিছল। কতদিন যে সে লুকিয়ে বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রেছে তাও কতক কতক শুনলাম।···কি বেহায়া! আমি এর জন্যই মরতে এসেছি আজ! এও নসীবে ছিল?···একবার মনে হ'ল শিকটা নসীবনের মাথায়ই বসিয়ে দি। কিন্তু খোদা রক্ষা ক'রলেন। তার গলার আওয়াজটাই শুধু পাচ্ছিলাম—মুখটা ছিল অন্য দিকে ফেরানো। মুখটা দেখতে পেলে যে কি হ'ত তা ব'লতে পারি না।···বুকের রক্তটা খুব জোরে চ'লে একেবারে থেমে গেল আর তারির সঙ্গে সঙ্গে মগজটা পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ভাবলাম—এই কসবীটার জন্যে আমি কেন গুণাগরির ভাগী হব? যদি জানতাম সে আমারই, আর তার উপর জুলুম হয়েছে তাহ'লে এমন অনেক জমিদারের শির দুফাঁক ক'রে দিতে পিছপাও হতাম না। কিন্তু তা যখন নয়, যখন তার নিজের ইচ্ছে-তেই সব হয়েছে, তখন আমি কেন তার জন্যে মরতে যাব?··· আগেকার নসীবনকে মনে প'ড়ে আমার ভিতর থেকে একটা বিকট হাসি উঠল।···সেটাকে চেপে বেরিয়ে আসবার সময় সিঁড়ির ধারে কি একটা পায়ে ঠেকে পড়ে গেলাম। তারপর কি হ'ল জানি না।···

যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম পুলিস দাঁড়িয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে দিতেই, হাতকড়া দিয়ে তারা নিয়ে চ'লল। যাবার সময় একবার পিছন ফিরে তাকালাম। মনে হ'ল ওপরের ঘরের জানালার ফাঁকে নসীবনের মুখখানা যেন উঁকি মারলে—আফ্‌শোসে-ভরা তার চোখ দুটো যেন ছল্‌-ছল্‌ ক'রছে।...হয়ত সেটা কিছু নয়... আমারই মনের ভুল।

তারপর সাতটি বছর জেলে কেটে গেল।

জেল থেকে বেরিয়ে আর দেশে ফিরলাম না। সেখানে কি-ই বা ছিল?...জেলের ভিতরেই খবর পেয়েছিলাম নসীবনকে জমিদার বাবু কোলকাতাতেই কোথায় রেখে দিয়েছেন। কিন্তু বেরিয়ে তার আর সন্ধান করবার ইচ্ছে হ'ল না। মনটা বদলে গিছল। আর অত বড় সহরে কোথায়ই বা তাকে খুঁজে পাব?...দেশের সমিরদ্দি দফতরি বৈঠকখানা অঞ্চলে দোকান খুলেছিল। তারই কাছে কাজে লেগে গেলাম। তারপর কিছুদিন এদেশ-ওদেশ ঘুরে লাহোরে, এই আখ্‌বরে দফ্‌তরির কাজে বহাল হলাম।...

ওহে জিওয়ারাম, এত দেরী লাগলো তোমার ওই প্রুফটা টানতে। আমরা দু'জনেই আজ হুজুরকে বহুৎ তক্‌লিফ্‌ দিয়েছি। খোদা নয় আজ আমার জিভের চাবি খুলে দিয়েছেন—তোমার পায়ে কি সয়তানের জিঞ্জীর লাগানো ছিল?...হুজুর, নসীবের লেখাই এমনি। লেখা ছিল তার সঙ্গে দেখা হবে ফের্‌। তাই একদিন তার দেখা পেলাম আনারকলির কসবী মহল্লায়।...খেতে পাচ্ছিল না—আর কি বদ্‌সুরৎ হয়ে গিছল সে!...দয়া হ'ল। হাজার হোক ছেলেবেলাকার আসনাই। ফেলতে পারলাম না, ঘরে নিয়ে এলাম।...

গোল বাঁধল এই খেনেই। নসীবন মনে ক'রলে আমি সেই

আগেকার নুর মহম্মদই আছি। সেও যে সেই নসীবনই, আর তার দিল্‌টা যে আগাগোড়া আমাতেই ভরপূর ছিল এইটে সে আমায় নানান্ রকমে শোনাতে চাইত। কি জঘন্য লাগত—যখন সে তার কোটরে-ঢোকা চোখ, আর তোবড়ানো গাল, মেচেতা-পড়া মুখের ওপর পাতাকাটা চুল বেঁধে আমার দিকে চোখ মিট্‌কে চাইত! সে কিছুতে বুঝত না যে তার আর সে রূপ নেই—পেত্নীর মত বিশ্রী হয়ে গেছে।···আমার মন যে অনেক দিনই বদ্‌লে গেছে সেটা বুঝতে তার দিনকতক সময় লাগল। তারপর সুরু ক'রলে ঝগড়া ক'রতে। দিনরাত। জওয়ার সিংএর আড্ডা ছাড়া আর কি উপায় ছিল, হুজুর? রাত কাটাতাম সেইখেনে আর দিনের বেলায় খাবার সময় সরাবের মুখে আমিও যা' খুশী তাই বলতে আরম্ভ করলাম।··· দেড়টি বছর এমনি ক'রে কাট্‌ল, হুজুর। তারপর আমার জাহান্নামের পথ খোলসা ক'রে দিয়ে সে ম'ল। এমন দুশমনি কেউ কারুর করেছে, হুজুর?···

আরে নাবিবক্‌স্, তোর কি কখনো আক্কেল হবে না? পেশওয়ারি উটের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছিলি নাকি? ওইখেনে আলোটা রাখলি—হুজুরকে কি আরো দুটো চোখ ধার ক'রে আনতে হবে? আর কলমদানিটা? তুই দফ্‌তরি হ'বি তখন যখন জাহান্নমে বরফ প'ড়তে সুরু হবে।···সেলাম, হুজুর, আপনার হুকুম মাফিক বান্দা বিদেয় নিচ্ছে। আল্লা হুজুরের বাকী রাতটুকু বেহস্তের স্বপ্নে ভরিয়ে দিন।···

* * * *

সমস্যা

বন্ধু সমী-র ঘরে বসে কথা হচ্ছিল।

আষাঢ়ের মেঘেঢাকা সন্ধ্যা। বাইরে একটা গুমোট ভাব ; ঘরের ভিতরের আবহাওয়াটাও মোজেল, চুরুট এবং বেলফুলের গন্ধে বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছিল।

সমী-র হাতে একখানা ছোট ছবি ছিল। রূপোর ফ্রেমে বাঁধা হাতীর দাঁতের উপর দিল্লীর পটুয়ার আঁকা নারীমূর্ত্তি। সমী-র একাগ্র দৃষ্টি তারির উপরেই নিবদ্ধ ছিল।

ঘরে ঢুক্‌তেই সমী জিজ্ঞাসা ক'রলে—মণি, ফিজিঅ'নমি জানা আছে তোমার ?

—না, তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কিছু জানা আছে।...দেখতে পারি ছবিখানা ?

সমী ছবিটা আমার হাতে দিয়ে ব'ললে—এটা কোন্ টাইপের ব'লতে পার ?...

—কোন্ টাইপের ?—বুঝলুম না। একটু বিশদ ক'রে ব'ললে ভাল হয়।

ছবিখানা যথাস্থানে রেখে সমী ব'ললে—একজন বিদেশী পণ্ডিত নারীদের বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একখানা বই লিখেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত-গুলো কতকটা আমাদের শাস্ত্রকারগণের স্বপক্ষে।···সে যাই হোক, তিনি নারী জাতটাকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন ! একটা হচ্ছে mother type, আর একটা যা' সেটা উচ্চারণ করে তোমার শুচি-বাইগ্রস্ত কর্ণে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব সেটাকে other

type বলেই জেনে রাখ।…ছবিখানি যার, তাকে কোন্ টাইপে ফেলবে ?

ছবিখানা আর একবার ভাল ক'রে দেখলুম। সুন্দরী বটে। সৌন্দর্যের ধরণটা নিখুঁৎ, তীক্ষ্ণ, আর তার জলুষটা পুরুষকে অন্ধ করিয়ে দেবার মত। কোমলতার চেয়ে ঔজ্জ্বল্যের দিকটাই ছবিতে বেশী পরিস্ফুট।

একটুও দ্বিধা না ক'রে বললুম—এ নিশ্চয়ই other typeএর।

সমী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—ওর ব্যবসাও ছিল তাই।—কিন্তু আমি অন্য রকম মনে করতুম একদিন।…সমস্ত গল্পটা না শুনলে তুমি বুঝতে পারবে না। শোন।

সমী গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে; আরাম-কেদারাতেই শুয়ে-ছিল, একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে অর্ধ নিমীলিত নেত্রে ব'লে যেতে লাগল।

* * *

লাহোরের বসন্তোৎসব ছেড়ে সেবার এসেছিলুম রাওলপিণ্ডিতে—বাকী শীতটুকু উপভোগ করবার জন্যে এবং বন্ধু লেনা সিং-এর নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যেও বটে।

লেনা সিং-এর মত দিলওয়ালা লোক পাঞ্জাবে আমার আলাপীদের মধ্যে কেউ ছিল না—যদিও বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তার চালচলনে এবং কথাবার্ত্তায় একটা গর্বিতভাবের পরিচয় পেত, যা' আমার নজরে কখন পড়েনি।

গর্বিত সে একটু ছিল হয় তো—কেননা, সে তার নিজের মর্য্যাদা বুঝত। তার শরীরে যে রক্ত ছিল তা' একেবারে তাজা—পুরোনো ব'লেই তাজা। ইতিহাসে হরি সিং নলুয়ার নাম পড়েছ তো? রণজিতি-আমলের কাবুলের শাসনকর্ত্তা হরি সিং—যার নামে এখনো

পাঠানেরা কাঁপে—সেই গোষ্ঠির এক শাখার বংশধর ছিল সর্দার লেনা সিং।...যখন গিয়ে পৌছলুম, তখন সেদিনের মত লেনা সিং-এর বাগান বাড়ীতে গানের মজলিশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

দিল্লী থেকে এসেছিল ঝিন্দন কোঁয়ার মুজরা করতে। উত্তর-ভারতের কোন বড় মজলিশই সে না হলে সম্পূর্ণ হ'ত না। শারেঙ্গী এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। আর রাত্রে শোবার আগে শানাইয়ে যে বেহাগ রাগিনী আলাপ করবে—তাকে আনা হয়েছিল সুদূর বেনারস থেকে। লেনা সিং-এর অতিথিদের অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না।

মজলিশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কিন্তু গানের ধূয়াটা তখনো সুরে বাজছিল—বাইজীর কণ্ঠে এবং শারেঙ্গীর সুরে—

"রনূজা হটাও দিলদার
মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—"

ঘরের মেঝ বোথ্‌রাই গাল্‌চেতে ঢাকা, তাতে মোগ্‌লাই ছবির মত সূক্ষ্ম কাজ—চারপাশে তুর্কী দিবান।

পানপাত্র শূন্য—অভ্যাগতদের হাতে তখন কফির পেয়ালা। লেনা সিং-এর সামনে কিন্তু তখনো ছিল শ্যাম্পেনের অর্ধশূন্য গ্লাস, আর হাতে ছিল সিগারেট।

লেনা সিং জাতীয় পদ্ধতির ধার ধারত না কখনো। শিখদের যা' নিষিদ্ধ—পান এবং চুরুট—তাই তার অতীব প্রিয় ছিল; এবং তাদের যা' অবশ্য কর্তব্য—লম্বা চুল এবং দাড়ী রাখা—তা' তার কাছে একেবারে অর্থহীন বলেই মনে হত। ছেলেবেলা থেকে ইংরাজ-সংশ্রবে থাকার ফল আর কি!

লেনা সিং-এর মুখ দেখলুম বিষণ্ণ-গম্ভীর—বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত, র তারই উপর এসে পড়েছিল ঝিন্দনের বিদ্যুৎ-কটাক্ষ। ঝিন্দনের

চোখে একটু উদ্বিগ্ন ভাবও ছিল। সে যেন লেনা সিং-কেই লক্ষ্য ক'রে গাইছিল—

"রন্‌জা হটাও দিলদার—
মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—"

ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, রাগ দূর কর।

প্রিয় যে কে, তা' বুঝতে পারলুম; কিন্তু তার রাগটা যে কেন, তা' কিছুই বুঝলুম না।

ঝিন্দনের পরণে ছিল চুড়ীদার পায়জামার উপর চুম্‌কির কাজ করা পেশোয়াজ; কিংখাবের কাঁচুলির উপর জরির আঙ্‌রাখা, আর সূক্ষ্ম ওড়নাটা পিঠের উপর দিয়ে নগ্ন বাহুর উপর এসে পড়েছিল। ছবিতে যা' দেখছ ঠিক সে রকমটা নয়—তার চাইতেও সুন্দর। গালে সিঁদূরের আভা, কপালে শ্রমজনিত ঘর্ম, তাতে কতকগুলো অলকগুচ্ছ জড়ানো, মদালস নয়নে একটু উদ্বিগ্ন ভাব। অনেক মজলিশে ঝিন্দনকে দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দর তাকে কখনো দেখি নি!

লেনা সিং-এর বাড়ীতে কিন্তু সেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা।

দ্বিতীয়বার দেখা তার পরদিন সকালেই।

ভোরবেলা বাগানে বেড়াচ্ছিলুম, ঝিন্দন বন্দেগি জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—একবার মেহেরবানি ক'রে বাঁদীর ঘরে পদার্পণ করলে দুটো কথা কইতে পারি—অনেক দিন পরে দেখা।

যাবার ইচ্ছা ছিল না, তাই পরিহাস ক'রে বললুম—বান্দা সামান্য লোক, খবরের কাগজে বাজে কথা লিখে কোন রকমে দিনপাত করে। তার কি তোমার ঘরে তস্‌রিফ্‌ রাখবার মত দুঃসাহস হ'তে পারে?

চোখের উপর ভুরু টেনে ঝিন্দন বললে—বেতমিজ, এমনি ক'রেই কথা কইতে হয়?

তারপর একেবারে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

একটু অপ্রতিভ হয়েছিলুম, তাই ঘরে ঢুকেই কোমল স্বরে বললুম—শহরবান, (ঝিন্দনের আর একটা নাম ছিল শহরবানু বেগম, যদিও কোনটাই ওর আসল নাম নয়) শহরবান, বেয়াদফি মাফ্ কোরো। জানই তো বাংলা দেশের পুরুষরা বড়ই রূঢ়ভাষী হয়ে থাকে।

ফর্সীর নলটা মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে ঝিন্দন বললে—সে কথা কি ঠিক?...আমি জানি, বাংলা দেশের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে—তার পূর্ব্বপারের লোকেরা রূঢ়ভাষী কিন্তু হৃদয়বান; আর তুমি যে দিকের, সে দিককার লোকের ভাষায় মিষ্টত্বের অভাব নেই বটে, কিন্তু হৃদয়টা বড় সংকীর্ণ।

বাংলা দেশের এত খবর যে রাখে, তার সঙ্গে তর্কে পারব না জানতুম, তাই কথা না বাড়িয়ে বললুম—মিষ্ট ভাষার সঙ্গে উদার হৃদয়ের মিলন হয় তো অসম্ভব না-ও হতে পারে।

—তার পরখ্ হবে এখনই।

আমাকে বসিয়ে রেখে ঝিন্দন পাশের ঘরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে সামনে এসে যে দাঁড়াল, সে তো দিল্লীর সুন্দরী-প্রধানা ঝিন্দন কোঁয়ার নয়—সে এক শুচিস্নাতা বঙ্গনারী। শিথিল অলক, পরনে চওড়া কালোপাড় মিহিন সাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ। মুখে শান্ত স্নিগ্ধ ভাব; চাহনি কোমল, নম্র।

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই সে আমায় প্রণাম করলে; তারপর আমারই পায়ের কাছে বসে পড়ে একেবারে খাঁটি বাংলায় বললে—আমি বাঙালী। সেই কথাই আজ বলতে এসেছি।

খুব বেশী আশ্চর্য হইনি, কেন না স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আশ্চর্য হওয়াটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতুম। তার পর যা' কথা হ'ল, তা' সংক্ষেপেই বলব।

তার নাম ছিল রমা। বাড়ী মাণিকগঞ্জ, শ্বশুরবাড়ী কলিকাতা।

স্বামীর অনাদর আর শ্বশুরবাড়ীর লাঞ্ছনায় সে যখন গৃহত্যাগ ক'রে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে এতটুকুও জানত না যে, অসংযমে তার প্রেমটা কখনো অবসন্ন হয়ে পড়বে এবং তার প্রেমাস্পদও তাকে ছেড়ে চলে যাবে। মাস কয়েকের মধ্যেই—যেমন হয়ে থাকে—সে দেখলে যে, পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা।

তার পরেকার কাহিনীগুলো শুনে কাজ নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে সময় থাকতেই ফিরতে পেরেছিল এবং তার প্রতিভার জোরে উত্তর ভারতে ভালমন্দের মাঝখানে যে একটা সমাজ আছে, তার মধ্যে নিজের একটা প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট ছিল না এবং এইখানেই আসল কথাটা এসে পড়ল।

সেটা হচ্ছে এই—

দিন দুয়েক হ'ল লেনা সিং তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। লেনা সিং-এর বন্ধুদের ভিতর আমিই একমাত্র তার স্বদেশবাসী; তাই আমার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে সে পরামর্শ চায়—কি করা কর্তব্য।

অনেক কথা হয়েছিল; কিন্তু ব'লে রাখা ভাল, আমি কোন পরামর্শই দিই নি।

যখন উঠে চলে এলুম—রমা আমায় কোন বাধা দিলে না। মুখ নীচু ক'রে বসে রইল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

লেনা সিং-এর হাত থেকে কিন্তু অত সহজে পার পাই নি। বিকেলের দিকে সে আমায় পাকড়াও করে তর্ক করতে উদ্যত হয়েছিল। রমা কিন্তু তর্ক করে নি। লেনা সিং-কে জিজ্ঞাসা করলুম—তাকে কি তুমি সত্যিই ভালবাস? সে বললে—ও কি একটা জিজ্ঞেস করবার মতন কথা?

তাকে গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিলুম—যাকে ভালবাস তাকে কখনো বিবাহ ক'র না—দুঃখ পাবে।

লেনা সিং রেগে গিয়ে বললে—তোমার মত cynic-এর উপযুক্ত কথাই হয়েছে।

লাহোরে ফিরে এসে সপ্তাহ বাদে শুনলুম তাদের বিবাহ হয়ে গেছে। শিখেদের মধ্যে যে আনন্দ-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে—সেই অনুসারেই বিবাহটা সুসম্পন্ন হয়েছে।

* * * *

সমী গল্প শেষ ক'রে সেই আগেকার কথায় ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলে—রমাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয় এখন?…একটা কথা মনে রেখো—মাতৃ-হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধার প্রেরণাতেই সে এত কাণ্ড করেছিল—অন্তত তার কথা থেকে আমি তাই বুঝেছিলুম। তার যদি একটি সন্তানও থাকত, তাহ'লে বোধ হয় সে অত সহজে গৃহত্যাগ করতে পারত না। লেনা সিং-কে সে ভালবেসেছিল, কিন্তু সে ভালবাসার মূলেও মনে হয় না কি যে তার মা হবার ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল?

একটু ভেবে বললুম—তাহ'লে তোমার কথাই মেনে তাকে mother type-এর ভিতরেই ফেলতে হয়।

সমী বললে—তাই বা কি ক'রে হবে? এই চিঠিখানা পড়লে বোধ হয় মত বদলাবে।

চিঠিখানা সেই দিনই এসেছিল। পড়ে দেখলুম, লেনা সিং-এর চিঠি। পড়ে জানলুম—লেনা সিং এবং রমার ভিতরে চিরন্তন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে—এই দেড় বছরের মধ্যেই।

হতাশ হয়ে বললুম—তাহ'লে আমার আগেকার কথাই ঠিক—ও হচ্ছে other type-এর।

সমী বললে—তাই বা কি ক'রে বলবে? সে এখন সন্তানের জননী। এমনও তো হতে পারে যে, তার মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা মিটে গেছে, তাই লেনা সিং-এর উপর থেকে তার ভালবাসাটাও চলে গেছে—যেমন সচরাচর হয়ে থাকে।

আমি বললুম—কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তার মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটবার সঙ্গে-সঙ্গে তার পূর্ব অভ্যাস আবার ফিরে এসেছে। এখন বহুপুরুষ-প্রণয়িণী হওয়া তার পক্ষে আশ্চর্য নয়।

—সে তা' কোন কালেই ছিল না এবং এখনো হতে পারবে বলে মনে হয় না।

—তাহ'লে তুমি কি বলতে চাও যে, সে শুধুই একটা খেয়ালের বশে স্বামীকে ত্যাগ করেছে এবারেও?

সমী ধীর-গম্ভীর ভাবে বললে—আমি কিছুই বলতে চাই নে। যে জার্মাণ পণ্ডিতের কথা বলেছি, তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকের ভিতর positive জিনিষ কিছু নেই। তারা না-ভাল, না-মন্দ। তারা হচ্ছে যাকে বলে non-moral; তাদের দায়িত্ব কিছুই নেই, তা' সে যে type-এরই হোক্।···কিন্তু তাহ'লেও সে যে কোন্ type-এর, তার তো কিছুই সাব্যস্ত হল না।

এ সব বিষয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই নি। তাই এই মতামতগুলো মাথার ভিতরে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সমী-র মস্তিষ্কের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার মতে ও কোন্ টাইপের?

সমী-র চোখ মুদে এসেছিল; কোনো উত্তর পেলুম না। বোধ হয় সেদিন মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছিল।

মুক্তি

১

যে সময়ের কথা বলছি তখন দার্জ্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি; এবং বার্চহিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুষ্পধনুটাই ছিল একমাত্র খেলবার জিনিস—যদিও দেখবার নয়।

এ কাহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদি যুগের বার্চহিল ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র; এবং এটা রচিত হয়েছিল মাত্র তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতান্ত অনাত্মীয়দের মধ্যে; নারীটি থাকত জলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বস্তির একটা আস্তাবলে—আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়বিধ চতুষ্পদেরই মধ্যে।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বার্চহিলে একত্রিত হয়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

২

সে দিন শরতের অপরাহ্ণ। বার্চহিলের সর্বোচ্চ চূড়াটার পশ্চিমে খানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের উপর নারী বসেছিল এবং পুরুষ তার পায়ের তলায় আর একখানা পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নারীর পরিধেয়ের আগুন-রংটা তাকে মানিয়েছিল ভাল। এই থেকে তার রূপের ও বয়সের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পুরুষের

রূপের পরিচয় অনাবশ্যক এবং তার গুণের পবিচয় দেবার মত বয়স তখনও হয় নি।

পুরুষ বলছিল—"সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক ক'রে ফেলেছি। রাত্তির দেড়টার সময় ডাণ্ডি অপেক্ষা ক'রবে—তোমাদের বাড়ীর সেই উপরকার রাস্তাটায়। রাত্তির থাকতেই ঘুম ছাড়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমরা কালিমপং-এ।"

পুরুষের স্বর স্নায়বিক উত্তেজনা-ব্যঞ্জক। নারী কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ কোমল স্বরেই একটু অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন করলে—"এর মধ্যেই"? তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—"কিন্তু তোমার দিক থেকেও তো কথাটা একবার ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে"?

পুরুষ যা' উত্তর করলে তার মর্ম হচ্ছে এই যে, সে যদি তার প্রেমের সৌরভে নারীর নষ্ট গৌরবটা ঢেকে দিতে পারে—তাতেই তার জীবনটা সার্থক হয়ে উঠবে। "এর বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই"।

উত্তেজনা সত্ত্বেও পুরুষের স্বরে এমন কিছু ছিল যা' নারীকে একেবারে স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। সেটা পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগ, গভীর সমবেদনার প্রকাশ, তীব্র কামনার প্রেরণা—অথবা এই তিনের মিশ্রনসঞ্জাত একটা কিছুও হতে পারে।

নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বার বার মনে পড়ছিল। সংসারের অপমান-অত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড্ড বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহ্য।......বর্তমানটা যাই হোক না কেন—ভবিষ্যৎটাই কি খুব আশাপ্রদ? সমাজ-সৌরচক্র থেকে গতিভ্রষ্ট হয়ে কোন্ অনির্দিষ্ট

শূন্যতার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যখন নেশাটা কেটে যাবে, তখন......?

মুখ ফুটে বললে—"এ রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন"?

"না—তা' আর চলতে পারে না"।

কেন চলতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে বললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাষ ছিল।

নারীর তখন মনে পড়ল—গৃহত্যাগ কল্পনাটা তো প্রথম তারই মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সম্ভব ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বরে বললে—"যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্তির ন'টার সময় তোমাকে শেষ জানাব"।

নারীর এই দ্বিধাভাবে পুরুষের দায়িত্বভাবটা বাড়্‌ল বৈ কম্‌ল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব করলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। "কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা কি"? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবতে দিলে না এবং নারীর কলহাস্যে ফেরবার পথটা মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল।

৩

সেই ফেরবার পথেই গাধার সঙ্গে দেখা।

যেখানে জিম্‌ নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ছিল একগোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল একটি ছেলে। নারীর হাস্যরবে সে কান খাড়া ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটল।

সহিস বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক'রলে এবং পিঠের ছেলেটি প'ড়ে যাবার ভয়ে চর্ম-বেষ্টনীটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শান্তভাবে মাথা বাড়িয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালে—যেমন ক'রে গাধারা দাঁড়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশ্বস্ত ক'রে গাধার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—"এ যে সেই পেম্বা"। এ যে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডঙ্কি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল। গেল বৎসর এমনি সময় রোজ দুবেলা সে পেম্বার পিঠে চড়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কত কথা কইত, কত ঝগড়া করত। কখন মারত, কখন গলা জড়িয়ে আদর করত। এই মূক প্রাণীটি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করত এবং তার পুরস্কার স্বরূপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন মিষ্টান্ন উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি!

নারীর চোখে জল ভরে এল।

পুরুষ বললে—"গাধারাও মনে ক'রে রাখে"?

নারী বললে—"গাধারাই বোধ হয় মনে ক'রে রাখে"।

পুরুষ ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দেবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল—"অর্থাৎ যারা মনে ক'রে রাখে তারাই বোধ হয় গাধা"। কিন্তু সামলে গেল। নারীর চোখে তখনও জল ছিল।

তারপর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

৪

চৌরাস্তার কাছে এসে গাধা নীরবে বিদায় নিলে। পুরুষও বিদায় চাওয়াতে নারীর চমক ভাঙল। বললে—"অন্তত আজকের দিনটা ক্ষমা ক'রো"।

পুরুষের মনের হাওয়াটাও ভিন্ন দিকে বইতে আরম্ভ করেছিল। তাই বোধ হয় বললে—"একদিন কেন, চিরদিনের জন্যই…"

তাদের আর কালিম্পং যাওয়া হল না।

বেশ বোঝা গেল পুরুষ ও নারীর উভয়েরই মনে হঠাৎ একটা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রাণীটির মধ্যে কোনই পরিবর্তন দেখা গেল না।

সে যে-গাধা সেই-গাধাই র'য়ে গেল।

আষাঢ়ে

১

প্রথমেই ব'লে রাখি, আমরা যাকে লেডি অ্যাবেস্ ব'লে সম্বোধন করতুম, তিনি ছিলেন আমাদেরই কালের একজন বঙ্গ-মহিলা; এবং তাঁর যে বাংলা নামটা ছিল, সেটা মর্ম্মস্পর্শী না হ'লেও শ্রুতিমধুর বটে। তবুও যে কেন তিনি ওই বিদেশী আখ্যায় অভিহিত হতেন, সে কথা বলতে গেলে আর একটা গল্পের অবতারণা করতে হয়। সে চেষ্টা আর একদিন করা যাবে।

যে দিনের কথা বলছি, সে দিনটা অ্যাবেস্ মহোদয়ার জন্মদিন, কি তাঁর আদুরে বিড়ালটার মৃত্যুদিন—তা' এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে সেটা যে ওই রকম একটা-কিছু স্মরণীয় দিন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দিন আমাদের মধ্যে একটা বন-ভোজনের উদ্যোগ চলছিল; এবং মনে আছে, সেটা ওই রকম কি একটা পর্ব উপলক্ষ ক'রেই।

উৎসবের কারণটা মনে না থাকলেও, উৎসবের দিনটা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন প্রথমেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিফল ক'রে দিয়ে, প্রাতঃসূর্য খাবার ঘরের পর্দার ফাঁকে দেখা দিলেন; এবং আমি ছাড়া সকলেই তাতে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ব'লে মনে হ'ল। পাহাড়ের কোলে আষাঢ়ের দিনটা এরকম ক'রে ফুটে ওঠা যে নিতান্তই একটা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্যাপার—তা' কারুর খেয়ালেই এল না। তাই ক্ষুণ্ন মনে বললুম—এই তো কলির সন্ধ্যা—অর্থাৎ সকাল। এখনও

সমস্ত দিনটা প'ড়ে আছে—মেঘ আসতে কতক্ষণ? ভগবান তো আছেন!

ভগবানের নামটা প্রাণের আবেগেই বেরিয়ে গিছল; কিন্তু বুঝলুম সেটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগেনি। কেন না সেটা শুনেই অ্যাবেস্ মহোদয়া অসন্দিগ্ধ সুরে আমায় জানিয়ে দিলেন যে, সেই নির্গুণ দেবতাটির নাম আমার মুখে শোভা পায় না,—যা' শোভা পায় তা' হচ্ছে আগুন।

এটাতে আমার চুরুটাগ্নির প্রতি কটাক্ষ হ'ল, কি আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থা হ'ল—তা' ঠিক বুঝতে পারলুম না। অতএব চুপ ক'রে রইলুম।

২

বিকেলের দিকে প্রস্পেক্ট্ পাহাড়ের উপর কামনা-দেবীর মন্দিরের ছায়ায় ঘাস-বিছানো একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে আমরা ক'জনে বসলুম। আমাদের দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের পরিচয় দেবার দরকার নেই, কেননা অনেকেই অ-পরিচয়ে শোভা পান ভাল—বিশেষত বিদেশ-বিভূঁয়ে। অ্যাবেস্ মহোদয়াই অবশ্য ছিলেন এই পিক্‌নিক্ চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কার্তিকেয় ছিলেন তাঁর স্বামী এবং তন্ত্রধারক, এবং আমি ছিলেম—পূজার ভাষায় কি বলে জানি না—তবে চলিত কথায় তাকে বলে ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

প্রবাদ আছে, সিমলার এই চুড়োটা থেকে শতদ্রু নদী দেখতে পাওয়া যায়। যখন একান্ত মনে এই প্রবাদটার সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করছিলুম, তখন হঠাৎ আমাদের দূরবীণের লক্ষ্যটা বন্ধ হয়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে দেখি, একটা ঘন-কুয়াসার পর্দায় আমাদের চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। পরক্ষণেই বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল।

আমার ভবিষ্যদ্বাণীর এই আংশিক সফলতা দেখে মনটাতে একটু স্ফূর্তি আনবার চেষ্টা করছি, এমন সময় অ্যাবেস্ মহোদয়ার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনটা জমে পাথর হয়ে গেল। তিনি আমার দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন যেন সমস্ত দোষটা আমারই। কুণ্ঠিত হয়ে বললুম—এতে আমার কোন হাত নেই, এবং যাঁর হাত আছে তাঁর নামও আমার মুখে আনা বারণ। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এবং আমার গায়ে-প'ড়ে ঝগড়া করবার অভ্যাসটার প্রতি তীব্র কটাক্ষ ক'রে বললেন—কে মশায়কে দোষ দিচ্ছে শুনি?

আশ্বস্ত হবার কথা—কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলুম না। লেডি অ্যাবেসর রাগটা তো শুধু কথাতেই ক্ষান্ত থাকত না—চা-য়ে নুনের সাযুজ্যে এবং পানে চুণের প্রাচুর্যে সেটা বেশ তীব্র ভাবেই প্রকাশ পেত। তাই একটু ভাব করবার মতন সুরে বললুম—এখন এই মন্দিরের চাতালে আশ্রয় নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু লেডি সাহেবের এ পরামর্শটা পছন্দ হ'ল না—বোধ হয় জুতো খুলতে হবে ব'লে।

যাই হোক, অবশেষে সেই মন্দিরের চাতালেই আশ্রয় নিতে হ'ল।

বৃষ্টি তখন বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে।

৩

সেখানে গিয়েই অ্যাবেস্ মহোদয়ার ফরমাস হ'ল—গল্প বলতে হবে। কিন্তু গল্প এখানে পাব কোথায়? যত সম্ভব রকম ভূতের গল্প সবই তাঁকে শুনিয়েছি, এবং যত অসম্ভব রকম মানুষের গল্প সবই তিনি পড়েছেন। বিশেষত, এটা যে সিমলা পাহাড়ের মন্দির-শোভিত একটা চূড়া। এটা তো আমাদের চিমনি-শোভিত খাবার ঘর নয়—যেখানে ভূতের গল্প মানুষে শোনে, এবং মানুষের গল্প ভূতেরাও যে অলক্ষ্যে না শোনে তা' নয়।

বন্ধু কার্তিকেয় আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। এই যে মন্দিরের পূজারী—ওর ওই আশী বছরের দাড়ীর পাকে-পাকে অনেক গল্প জড়ানো আছে নিশ্চয়—সেইগুলো শুনলে হয় না?

অ্যাবেস্ মহোদয়া কিছু বলবার আগেই বৃদ্ধ স্বয়ং প্রসাদী বাতাসা হাতে নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হ'ল। তাকে ধরে বসতেই সে একেবারে গল্প সুরু ক'রে দিলে—যেন সে গল্প বলবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে। আশ্চর্য নেই—বৃদ্ধেরা একবার গল্প বলবার সুযোগ পেলে হয়—তখন তাদের ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল।

বৃদ্ধের গল্প শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম বটে, কিন্তু তার পরিচয়টা আমাদের সকলকেই অবাক্ ক'রে দিলে, বন্ধু কার্ত্তিকেয় ছাড়া। পরিচয়টা তাঁর বোধ হয় কানের ভিতর পৌঁছলেও মর্মে গিয়ে পৌঁছয়নি। কে মনে ভেবেছিল যে, উনবিংশ শতাব্দীরও পরে সিপাহী বিদ্রোহের এক জলজ্যান্ত অভিনেতাকে সিমলা পাহাড়ের কামনা-দেবীর মন্দিরের পূজারীরূপে দেখতে পাব! আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। ভূতের গল্প না হলেও তার চেয়ে চানকের পূরবিয়া পল্টনের ভূতপূর্ব সুবাদার নওলপ্রসাদের গল্পটা যে কম জমবে তা' বলে মনে হ'ল না।

গল্পের প্রারম্ভেই নওলপ্রসাদ পাত্রাপাত্রীর পরিচয় দিয়ে দিলে। তাদের পল্টনে একজন খৃস্টান ডাক্তার ছিল। তার নামটা বিদেশী ধরণের হ'লেও রংটা ছিল একেবারেই স্বদেশীয় এবং ব্যবহারটা ছিল স্বদেশী-বিদেশী কিছুরই মতন নয়। এই লোকটারই কুব্যবহারে সে অবশেষে বিদ্রোহে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। গোড়াতেই যে দেয়নি সে কেবল সেই লোকটার বাঙ্গালী স্ত্রীর খাতিরে। সেই বাঙ্গালী নারী হাঁসপাতালে একবার সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা নওল-

প্রসাদকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, এবং সেই অবধিই নওলপ্রসাদ তাঁর কেনা গোলাম হ'য়ে গিছল।

নওলপ্রসাদ বললে, "তিনি ত সামান্যা নারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেবী"—যদিও তাঁর নামটা ম্লেচ্ছ ধরণের ছিল, এবং পোষাক পরতেন মেম সাহেবদের মতই।

গল্পটা তো সত্য ব'লেই বোধ হতে লাগল। সে সময়কার বাঙালী খৃস্টান মহিলারা তো আজকালকার মতন সাড়ী পরতেন না—তাঁরা পরতেন সেই সে যুগের বেলুনের মত ফোলা ক্রিনোলীন। সেই ক্রিনোলীন-পরিহিতা বাঙালী দেবীমূর্তির ধ্যানে মনটাকে একটু সরস করে নিলুম।

৪

গল্পও চলতে লাগল, তার সঙ্গে আমাদের মুখও চলতে লাগল। অ্যাবেস্ মহোদয়াকে ধন্যবাদ—আমাদের ভিতরকার মানুষটির তুষ্টির জন্য কোনরূপ আয়োজনের ত্রুটী হয়নি। সুতরাং সমস্ত গল্পটা শোনা আমাদের সকলকার ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। তবে রক্ষা এই যে, নওলপ্রসাদ গল্পটা বিশেষ ক'রে তার "মাইজি"কেই সম্বোধন ক'রে বলছিল। তার বিদ্রোহে যোগ দেবার পর থেকে কানপুর যাওয়া পর্যন্ত যে সব লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটেছিল, সে তার কিছুই বাদ দেয় নি, কিন্তু সে সব খুঁটিনাটি এখন আর আমার কিছুই মনে নেই। তবে কানপুরে পৌঁছে সে যে নানা সাহেবের দলে যোগ দিয়েছিল—এটা ঠিক। তারপর কি হ'ল তার নিজের ভাষাতেই বলা যেতে পারে—

"সে সময় আমার ভিতর একটা সয়তান জেগে উঠেছিল, মাইজি! আর সেই বাংলা মুলুকের দেবীমূর্তি মন থেকে একেবারেই মুছে

গিছল। তাই নানা সাহেব যখন বন্দীদের মেরে ফেলবার প্রস্তাব করলে, তখন আমিই প্রথম তলওয়ারের আগা বাড়িয়ে গেলুম। গিয়ে কিন্তু দেখলুম কি? গারদখানার দরজা খুলেই দেখি—সেই দেবী মূর্তি, তাঁর ছোট মেয়েটিকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন!"

তখন তাঁর ক্রিনোলীন পরা ছিল কিনা নওলপ্রসাদ তা' বলতে পারলে না। বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গিছল ব'লে অতটা লক্ষ্য করেনি। যাই হোক, সে নিজেকে সামলে নেবার আগেই তিনি কিন্তু নওল-প্রসাদকে চিনে ফেললেন এবং আশ্চর্য হয়ে বললেন,—"নওলপ্রসাদ তুমি!"

বাঃ—এই না হ'লে গল্প! নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম। এইবার গল্পটা জমবে ভাল। নিছক বীর-রস কি সহ্য হয়? তার সঙ্গে একটু আদিরসের মিশ্রণ না হ'লে ভাল শোনাবে কেন? মুখেও ব'লে ফেললুম,—"এই যে প্রাণের একটা প্রচ্ছন্ন টান—নওলপ্রসাদের দেশের ফল্গু নদীরই মত—এইটেকে আর একটু ফেনিয়ে তুলতে পারলেই—"

আমার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে অ্যাবাস্ মহোদয়া বললেন "তুমি থাম, আইবড় কার্তিক!"

আমি আইবড় ছিলুম সত্য, কিন্তু কার্তিক ব'লে আমায় কেউ কখন ভুল করেনি। বন্ধুরাও নয়—শত্রুরা তো নয়ই। আমি নিজে একবার ভুল করেছিলুম বটে, এবং তার ফলে—কিন্তু সে গল্প আজ আর নয়। বুঝলুম এটা নিতান্তই পরিহাস।

নওলপ্রসাদের গল্প ইতিমধ্যে অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। নানা সাহেবের কাজে ইস্তফা দেবার পরেই এবং আর কেউ সে কাজটার ভার গ্রহণ করবার আগেই সে যে কি কৌশলে সেই অসহায়া বঙ্গনারীকে গারদখানা থেকে উদ্ধার ক'রে, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে, এলাহাবাদের ইংরেজ বারিকে নিরাপদে

পৌঁছে দিলে—সেই সব কাহিনী সবিস্তারে ব'লে যেতে লাগল। এই রোমান্সটুকু ছিল ব'লেই রক্ষা। রোমান্সবর্জিত বীরত্ব—সে তো গুণ্ডামি।

ব্যাপারখানা একবার মানস-নেত্রে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুললুম। এই পূরবিয়া বীর যখন তার আরাধ্যা দেবীকে বুকের কাছে নিয়ে গভীর রাত্রে তেপান্তর মাঠের শেষে এক নিরুদ্দেশ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছিল, তখন ঋতুটা জুৎসই গোছের না হ'লেও রাত্রিটা যে জোৎস্না-বিকশিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।......সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী; কণ্ঠে মৃণাল ভুজের বন্ধন; বক্ষে যৌবন-গীতির স্পন্দনতাল; অমৃতের পাত্র মুখের এত কাছে তবু এত দূরে......হঠাৎ আমার কল্পনাটা প্রতিহত হ'ল—সেই কোলের মেয়েটির কথা মনে প'ড়ে। নওলপ্রসাদ তো তার আরাধ্যা দেবীকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুট্ দিলে, এবং তিনিও প'ড়ে যাবার ভয়ে দু'হাতে নওলপ্রসাদের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু সে অবস্থায় কোলের মেয়েটিকে কি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল—তা' নওলপ্রসাদও কিছু বললে না, এবং আমিও রসভঙ্গের ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলুম না।

৫

নওলপ্রসাদের গল্প শেষ হয়ে এল। বিদায় নেবার সময় তার আরাধ্যা দেবী আবার দেখা হবে ব'লে আশা দিয়েছিলেন, এবং সে তাঁরই প্রতীক্ষায় অতদিন ধরে জীর্ণ শরীরটাকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আহা বেচারা!

অ্যাবেস্ মহোদয়া করুণার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখা হয়েছিল কি?

বৃদ্ধ বললে—দেখা হয়েছে, না-ও হয়েছে। সে বুঝিয়ে দেবার পর বুঝলুম যে, অ্যাবেস্ মহোদয়ার কণ্ঠস্বরে তার পূর্বস্মৃতি জেগে উঠেছিল, তবে দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণ চেহারাটা ঠিক মালুম করতে পারেনি।

গল্পটা যে ঠিক এ রকম পরিণতি নেবে, সেটা আমরা কেউ আশা করিনি; অতএব সকলেই একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম—বন্ধু কার্তিকেয় ছাড়া। এই হাস্যকরুণরস বর্জিত মানুষটির তুলনা পাওয়া ভার।

কিন্তু কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না—অ্যাবেস্ মহোদয়ার মুখের দিকে চেয়ে। তাঁর মুখের রং একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিছল। তাঁর পূর্ব কথা মনে পড়েছিল কিনা কে জানে। নিরুদ্দেশ মাতামহ শৈশবে মাতার ইংরাজ পাদ্রী পরিবারে প্রতিপালিত অবস্থা—এ সবের সঙ্গে কি এই কামনা দেবীর মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারীর কোনরূপ যোগ থাকা সম্ভব?

তাঁর মুখের ভাবটা এবং মনের প্রশ্নটা—তাঁর স্বামীর চক্ষু এড়ায়নি। তাই বোধ হয় তিনি বাড়ী যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

ইতিমধ্যে বৃষ্টিও থেমে গিছল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল; এবং রিক্‌শ-কুলিরাও বাড়ী ফেরবার জন্যে তাগাদা দিচ্ছিল।

বৃদ্ধকে বাড়ীতে আসবার নিমন্ত্রণ ক'রে অ্যাবেস্ মহোদয়াও তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

৬

বাড়ী ফেরবার পথে ব্যাপারখানা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীরবতার অবতার বন্ধু কার্তিকেয়ের ভিতর যে এত ছিল, তাতো জানতুম না। আদুরে বিড়ালটার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর যে পরিমাণে দুঃখ হয়েছিল, তাঁর নিজের ঠিক সেই পরিমাণেই স্ফূর্তি হয়েছিল।

সেই স্ফূর্তিটা ভাল ক'রে উপভোগ করবার জন্যে এবং পরোক্ষভাবে স্ত্রীর দুঃখটা লাঘব করবার জন্যে তিনি এই গল্পটা বানিয়েছিলেন, এবং আগের দিনে বৃদ্ধ পূজারীকে বকশিষ দিয়ে তার নামেই বেনামি ক'রে চালাবার বন্দোবস্ত করেছিলেন।

বন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। কিন্তু সেটা জ্ঞাপন করবার সময় জানতে পারিনি যে, অ্যাবেস্ মহোদয়া ঠিক আমাদের পিছনের রিক্‌শতেই আছেন। তিনি আমাদের কথা-বার্তা সবটা শুনতে পাননি, তবে যতটুকু শুনতে পেয়েছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—এবং আমার পক্ষেও বটে; কেন না ধরা পড়বার সময় বন্ধু কার্তিকেয় সমস্ত দোষটা আমার স্কন্ধে বেমালুম চাপিয়ে দিলেন। শাস্ত্রকারেরা ভুল করেছিলেন—"বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং"—এর পরে— "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" না বসিয়ে "স্ত্রীষু স্বামীষু চ" বসান উচিত ছিল।

ফলে এই দাঁড়াল যে, তারপর যতদিন সিমলায় ছিলুম, আত্মরক্ষার জন্য আমি চা ও পান খাওয়া বন্ধ করেছিলুম, এবং জেদ রক্ষার জন্য অ্যাবেস্ মহোদয়াও আমার সঙ্গে কথাবার্তা একরূপ বন্ধই করেছিলেন।

একদিক

আমার দ্বিতীয় বার সংসার করবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা এই—

ডাক্তারি পড়া স্বরু করবার কিছু পর থেকেই পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। তার বছর দুত্তিনের মধ্যেই বিলাত যাত্রা। ইতিমধ্যেই আমার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল এবং পুত্রমুখ দেখবার সৌভ'গ্যও হয়েছিল। বিলেতে কিছুদিন থাকতেই স্ত্রী পুত্র উভয়েরই সংক্রামক ন্যুমোনিয়ায় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনের অবস্থা কি রকম হ'ল তা' ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবেনা। পাশ করবার পর সেখানেই একটা হাঁসপাতালে কাজ জুটল। দেশে ফেরবার মতন মানসিক অবস্থা হ'তে আরও বৎসর কয়েক কেটে গেল।

বিবাহ করবার আর ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দেশে ফিরে দেখলুম বিবাহ না করলে ডাক্তারের পক্ষে পসার জমানো বড় শক্ত ব্যাপার। অনেকটা বিলেতেরই মতো। কিন্তু একটা জিনিস দেখলুম যা' বিলেতের মত মোটেই নয়। সেখানে অবিবাহিত ডাক্তারের পসারে ঘা পড়লেও তার অবসর-যাপনে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। এখানে তাও নয়। এখানকার সামাজিক আবহাওয়ায় আমার নিঃসঙ্গতা আমার কাছে বড় বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। সারাদিন খেটে এসে বিরল সন্ধ্যায় দু'খানি কল্যাণ হস্তের সেবা যত্ন পেতে মনটা এক এক সময় বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠত, কিন্তু নিজের কাছেও অনেক সময় সেটা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হ'ত! ওটা একটা সাময়িক দুর্বলতা ব'লেই মনকে প্রবোধ দিতুম।

এই রকম ক'রে বছর দুয়েক কাটবার পর বুঝলুম—মনকে ফাঁকি

দেওয়া চলে না। আরও দেখলুম মনটা সত্যিই যা' চায়, বাইরে তার আয়োজনের অপ্রতুল হয় না। সমাজের যে-স্তরে আমার পসার গ'ড়ে উঠছিল, সেখানে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব ছিল না আর পরোপকারী বন্ধু তো সমাজের সর্বস্তরেই বিরাজমান। অতএব লীনার সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক হ'তে বিশেষ কিছু বেগ পেতে হ'ল না। লীনা সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। সকলেই বললে—সর্বাংশে আমার উপযুক্ত। আমিও পৌরুষগর্বে সেটা নির্বিবাদে মেনে নিলুম।

যেমন হয়ে থাকে, পূর্বরাগের একটা ঠাট বজায় ছিল মাত্র, বিশেষ কোন আয়োজন ছিল না। কথাবার্তা ঠিক হয়ে যাবার পর লীনার সঙ্গে একটু আলাপের সুযোগ পেয়েছিলুম—এই যা'। সেই আলাপের অবসরে আমার ভাবী স্ত্রী বোধ হয় আমার সাময়িক মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিল। বিবাহ ঠিক হয়ে যাবার পর, কেন জানি না, মনটাতে একটা বিষম বিরক্তি ভাব এসেছিল। মনে হচ্ছিল রোমান্স জিনিসটা আমার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বার বিবাহ নিতান্ত সুখ সুবিধার জন্যই। তারির বদলে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে অর্থ-স্বাচ্ছল্য এবং সামাজিক প্রতিপত্তি দিতে পারলেই যথেষ্ট। ভাগ্য এবং অবস্থা এ বিষয়ে আমার অনুকূল ছিল। আমার ভাবী স্ত্রীও এ বিষয়ের আলোচনা থেকে আমায় রেহাই দিয়েছিল। তখন জানতুম না যে এই নীরবতার ফলে—কিন্তু আগে থাকতে তা ব'লে কি হবে?

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও যে স্বামীর কাছ থেকে অর্থ-প্রতিপত্তি ছাড়া আরও কিছু চায় তা' বুঝলুম বিবাহের মাসকতক পরে। এবং সেটা যে কী তা' ঠিক বুঝতে পারিনি বললে মিথ্যা বলা হবে। তা সত্ত্বেও মিলনের মোহটা কেটে গিয়ে যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল তখন তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম নিজেকে বাইরের কাজে ব্যাপৃত রেখে। ভেবে চিন্তে নয়, আমার

ভাগ্য-দেবতা এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করেছিলেন। তবে এবং বোধ হয় সেইজন্যেই যেটুকু সময় লীনার সঙ্গে কাটাতে পেতুম সেটুকু খুব নিবিড় ভাবেই উপভোগ করতুম। কিন্তু এ উপভোগটা ছিল আত্মসর্বস্বতায় ভরা। লীনার প্রচুর অবসর যে কি ক'রে কাটে সে ভাবনা তখনও পর্যন্ত আমাকে চঞ্চল করেনি। কতকগুলো ব্যাপারে সেটা আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

গৃহে দাসদাসীর অভাব ছিল না, তবু হঠাৎ দেখলুম লীনা রান্না এবং ভাঁড়ার ঘরের খুঁটিনাটিতে নিজেকে জড়িত ক'রে ফেলেছে। সামাজিক ব্যাপারে নিজেকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করবার আগ্রহ লীনার মোটেই ছিল না; হঠাৎ দেখে আশ্চর্য হলুম যে কোথাও যাবার কথায় লীনার উৎসাহ আর বাধা মানতে চায় না। নিতান্ত লৌকিকতার নিমন্ত্রণ যেখানে আমাদের অনুপস্থিতি কারুর লক্ষ্যগোচর হবার কথা নয়—এমন সব জায়গাতেও যাবার ইচ্ছা শত অসুবিধাসত্ত্বেও লীনা দমন করতে পারত না। তখন মনে করতুম এগুলো নারীসুলভ দুর্বলতা—সদ্য-বিবাহিতা বধূর পোষাক এবং গহনা দেখাবার লোভ মাত্র। তবু মনটা ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত। আমার বিরল অবসরটুকুতেও লীনাকে অনেক সময় কাছে পেতুম না—নিতান্ত অদরকারী কাজে ভাঁড়ার-ঘরে ব্যাপৃত দেখতুম নয়ত নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকেই তাকে নিমন্ত্রণ সভায় নিয়ে যেতে হ'ত। মনে এক এক সময় অভিমান হ'ত, আমি তাকে যেমন ক'রে চাই, সে আমাকে তেমন ক'রে চায় না কেন? নিজের মনের এ-পরিবর্তনেও সান্ত্বনা যথেষ্ট ছিল না।

এমন সময় কাথিওয়াড়ে আমার ডাক পড়ল—এক দেশীয় রাজ্যের যুবরাজের চিকিৎসার জন্যে। তিন সপ্তাহের জায়গায় সেখানে তিন মাস কেটে গেল। লীনা এই সময়টা তার আত্মীয়দের কাছেই ছিল।

এই তিন মাস—সত্য কথা বলতে কি—একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলুম। লীনার চিঠি প্রথম প্রথম রোজই পেতুম। তারপর ক্রমশ সময়ের ব্যবধানটা বেড়ে যেতে লাগল। এতে আমার অনুযোগ করবার কিছু ছিল না, কেননা আমি নিজে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে ঠিক নিয়ম পালন করতে পারতুম না—কতকটা কাজের ভিড়ে এবং কতকটা জন্মগত আলস্যের দরুণ। অনুযোগ করবার মতো মনোভাবও আমার ছিল না কেননা লীনার শেষদিককার চিঠিগুলো অনিয়মিত হ'লেও আকারে বেশ বড় হ'ত। তাতে অনেক রকম কথা থাকত—কার্ কার্ সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কোথায় কোথায় যাওয়া হয়েছে, নিমন্ত্রণ-সভার চেনা-অচেনা সুন্দরীদের রূপ এবং পোষাক বর্ণনা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ভাল মন্দ বিবরণ—সবই তাতে থাকত।

এই চিঠিগুলো থেকে জানলুম—লীনার সঙ্গে এই ক'সপ্তাহে অনেকের আলাপ হয়েছে। তার মধ্যে লীনার জ্ঞাতিভ্রাতা বুটিদা'র বন্ধুবর্গের বর্ণনা আমাকে খুব আমোদ দিত। শ্বশুর-গৃহের এই বুটিদা'টির উপর আমার একটু টান ছিল—তবে সেটা যতটা স্নেহের ততটা শ্রদ্ধার নয়। এ-গল্পের সঙ্গে তার এত কম সম্পর্ক যে তার বেশি পরিচয় দেবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, শত দোষ সত্ত্বেও লীনার তার উপর একটা নির্ভরের ভাব ছিল আর সেও লীনাকে কতকটা স্নেহ-চক্ষে দেখত। তবে এ লোকটির দায়িত্ব জ্ঞান একেবারে ছিল না বললেই হয়।

বুটিদা' কতকগুলো কর্মহীন যুবককে চরিয়ে নিয়ে বেড়াত—কি উদ্দেশ্যে তা' কখনো খোঁজ করবার দরকার বোধ করিনি। লীনা এই দলটিকে একটু মমতার চক্ষে দেখেছিল,—তার চিঠিতে এদের বিষয়ে কৌতুক-উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ সহানুভূতির আভাসও

পেতুম। এদের নিয়ে লীনার একটু সময় কাটাবার সুবিধা হয়েছে জেনে আমিও কতকটা আশ্বস্ত হতুম।

কোলকাতায় ফিরে এই দলটির সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। এই দলের মধ্যমণি ছিল খদ্যোৎ। তার পরিচয় দিলেই দলের আর কারুর পরিচয় দেবার দরকার হবে না, কেননা আর সকলে এই খদ্যোতেরই কম বেশি প্রতিরূপ ছিল মাত্র।

খদ্যোৎ লোকটি ছিল হ'লে-হ'তে-পারত রকমের। অর্থাৎ তার বড়-একটা কিছু হওয়া হ'ল না—পৃথিবীশুদ্ধ লোকের ষড়যন্ত্রে। কবি, আর্টিষ্ট, পাটের ফড়িয়া, রাজনীতিওয়ালা, অভিনেতা, উকীল, ইন্‌সিওরেন্সের দালাল—এর যে-কোন একটা এবং খুব বড়-একটা হ'তে পারত—শুধু হ'ল না ওই ষড়যন্ত্রের ফলে। এমন ষড়যন্ত্র কেউ কখনো দেখেনি। তার শত্রু অনেক—ঘরে এবং বাইরে। এই কথাটা সে এমন বিনিয়ে বিনিয়ে বলত যে, প্রথম প্রথম তাকে দয়া না ক'রে থাকতে পারা যেত না। নারীর মন তো ভিজবেই। বিশেষ ক'রে লীনার মনটা ছিল স্বভাবতই কোমল, দয়াপরায়ণ।

সাধারণ মেস্-পালিত যুবকের একটা সামাজিক আড়ষ্ট ভাব থাকে, খদ্যোতেরও তা' ছিল। কিন্তু একটু রকম-ফের্‌ও ছিল। সে পাঁচজনের কথাবার্তায় যোগ দিতে পারত না সত্য, কারুর মুখের দিকেও ঋজুভাবে চাইতে পারত না, কিন্তু লীনাকে একটু একলা পেলে তার আড়ষ্টভাব ঘুচে যেত। তবে সকলের কানের আড়ালে জানলার কাছে না গেলে তার মুখ ফুটত না, নয়ত ঘরের এক কোণে বই পড়বার অছিলায় লীনার কাছে সে তার মনের কবাট খুলত। সে যে কী বলত তা' জানি না এবং লীনাকে কখনো জিজ্ঞাসাও করিনি। পরে জেনেছিলুম লীনার দুর্বলতা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। নিজের তথাকথিত দুর্ভাগ্যের কথা ব'লে সে একদিক থেকে লীনার

মনে দয়ার উদ্রেক করতে চেষ্টা করত, আর একদিক থেকে লীনাকে বোঝাত যে সে তারই প্রেরণায় এতদিন পরে জীবনে একটা নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছে। লীনার অনভিজ্ঞ নারীহৃদয় এতে গর্বিত না হয়ে থাকতে পারত না।

খদ্যোতের ভিতরে একটা মনুমেণ্ট-প্রমাণ আত্মম্ভরিতা ছিল। সেটা তার বাহ্য দীনভাবের আবরণে সাধারণত ঢাকা থাকত। একটু ঘনিষ্ঠ আলাপেই সেটা প্রকাশ পেত। আমার সঙ্গে আলাপের দিনকয়েক পর থেকেই তার আড়ষ্ট ভাবের বদলে সপ্রতিভ ভাবটাই বেশি ক'রে নজরে পড়তে লাগল। এতে আশ্চর্য হইনি, কেননা আমার সঙ্গে আলাপের অনেক দিন আগেই লীনার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল। লীনার কাছে উৎসাহ পেয়ে তার এই সপ্রতিভ ভাবটা কত শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে উঠছিল, তা' একটা দিনের সামান্য কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে।

একদিন থিয়েটারী ঢংএ ঘরে ঢুকে খদ্যোৎ ব'ললে—নরেশ বাবু, আমাকে এমন একটা ওষুধ দিতে পারেন, যা' খেলে আমার মনোহারী শক্তিটা একটু কমে। আর তা' যদি সম্ভব না-ই হয়, তা'হলে লীনাদি', আপনি আমায় পর্দানশীন ক'রে রাখুন। আর পারা যায় না।

—কি ব্যাপার?

লীনার দিকে চেয়ে সে বললে—আর কি—সেই পুরাতন কথা।

অর্থাৎ খদ্যোৎকে দেখে এতগুলো অপরিচিত নারী যদি প্রেমে পড়ে, তাহ'লে বেচারার খেয়ে-শুয়ে স্বস্তি কোথায়? রেল-স্টেশনে, ট্রামগাড়ীতে, থিয়েটারে, ফুটবল ম্যাচে—কোথাও বেচারার শান্তি নেই। এমন-কি রাস্তা দিয়ে চলবার সময়েও গাড়ীর পাখীর ভিতর দিয়ে তার উপর কটাক্ষবাণ এসে পড়বেই! বেচারা করে কি?

খদ্যোৎ দেখতে মন্দ ছিল না। ধরণ-ধারণে সম্ভ্রমের অভাব

থাকলেও, তার চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া। তবে সামান্য লক্ষ্য করলেই দেখা যেত যে তার মুখে একটা বিশ্রী চোয়াড়ে রকমের ভাব সর্বদা লেগে আছে। সেইটেই ছিল তার বিশেষত্ব। কিন্তু তার নিজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তার চেহারার মধ্যে এমন-একটা মোহিনী শক্তি আছে যা' দেখে নারীমাত্রেরই মন ভুলে যায়। এই বিশ্বাসের ফলে একবার সে যে কি নাজেহাল্ হয়েছিল—কিন্তু সে গল্প আজ আর নয়।

খদ্যোতের দলটি ছিল পেশাদারি স্বদেশিয়ানায় একেবারে পক্ক। ভেক্-এর কিছুমাত্র ত্রুটি ছিলনা। মোটা ধুতি এবং জামার সঙ্গে চাদরটা এবং অনেক সময় জুতোটাও এদের কাছে বাহুল্য ব'লে মনে হ'ত। সত্য কথা বলতে কি—এরা এত ময়লা ঘামে-ভেজা কাপড় প'রতে অভ্যস্ত ছিল যে এদের বসাবার জন্যে আমাকে একটা স্বতন্ত্র ঘর ঠিক করতে হয়েছিল। এতে তাদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, বরং সেই ঘর উপলক্ষ্য ক'রেই এদের একটা আলোচনা সভা স্থাপনের সুবিধা হ'ল। লীনা এবং আমি কাজের অবসরে মধ্যে মধ্যে সেই সভায় এসে বসতুম। সেদিন এদের উৎসাহের অন্ত থাকত না। লীনা ছিল এদের দেবী, এদের রাণী, এদের দিদি—একাধারে সবই। আমি খুব আমোদ পেতুম, কিন্তু লীনা দেখতুম এতে বেশ একটু গর্ব অনুভব করত। প্রথম প্রথম আমার পরিহাসে লীনা চুপ ক'রে থাকত। ক্রমশ দেখলুম আমার পরিহাস তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে। অতএব আমোদটা আমি একাই উপভোগ করতে লাগলুম।

এদের সভায় বিশেষ ক'রে আলোচনার বিষয় ছিল দেশের দুর্গতি এবং বর্তমান য়্যুরোপীয় সাহিত্য—তবে তার ইংরাজী অংশটুকু বাদ দিয়ে। ইংরাজী সাহিত্যের উল্লেখ মহা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'ত।

তার কারণ হচ্ছে এই যে, ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে এদের অনেকেরই পরিচয় ছিল না এবং কণ্টিনেণ্ট্যাল সাহিত্যের সঙ্গে এদের সকলেরই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল—বাংলা কাগজের আলোচনা স্তম্ভের উদ্ধৃত অংশ প'ড়ে।

একদিন সভায় ঘেঁটুফুলের উপর খদ্যোতের লেখা এক সুদীর্ঘ কবিতা পড়া হ'ল। সমালোচনাচ্ছলে সকলেই বাহবা দিলে। তারপর আরম্ভ হ'ল খদ্যোতের ব্যাখ্যা। সে এক পুরোদস্তুর বক্তৃতা। তাতে অনেক কথাই ছিল। তবে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় সৌখীন জিনিস নিয়ে মনের অপব্যবহার করা উচিত নয়। দৈনন্দিন জীবনেও নয়, আভ্যন্তরিক জীবনেও নয়। দেশকে একটা বস্তুভাবে দেখতে হবে এবং তা' দেখতে গেলে দেশের মধ্যে যা' কিছু কুৎসিত, যা' কিছু ঘৃণ্য, তা'কেই বরণ ক'রে নেওয়া উচিত। সুন্দরের পূজা ক'রেই আমাদের বর্তমান দুর্দশা। জীবনটাকে বস্তুগত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যকেও বস্তুতন্ত্রপরায়ণ ক'রে তুলতে হবে। অর্থাৎ যা' কিছু নোংরা, বীভৎস, এমন কি সাধারণে যাকে অশ্লীল বলে, তাই নিয়ে—এবং একমাত্র তাই নিয়েই—আমাদের এখন সাহিত্যের ও জীবনের পুষ্টি সাধন করতে হবে। এ থেকে যিনি সঙ্কুচিত হবেন, তিনি যেন স'রে দাঁড়ান। তাঁর বর্তমান জগতের চিন্তাধারার সঙ্গে, অর্থাৎ কণ্টিনেণ্ট্যাল সাহিত্যের সঙ্গে, পরিচয় নেই বুঝতে হবে।

রাত্রে লীনাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এর implication-টা কিছু বুঝলে?

লীনার মেজাজটা সেদিন ভাল ছিল না বোধ হয়। আমার কথার উত্তর না দিয়ে ব'লে উঠল—এরা গরীব ব'লেই তুমি এদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর—শুধু পরিহাসের পাত্র ব'লেই মনে কর। এটা অন্তত

মাননা কেন যে, আমরা যা' করতে পারিনি, ওরা তা' করেছে? স্বদেশ ও সহিত্যের ওরা একটা আদর্শ খাড়া করেছে এবং তার জন্যে দারিদ্র্যকে মাথা পেতে নিতে ওদের এতটুকুও আপত্তি নেই।

এ কথার কি উত্তর দেব? লীনাকে কি শেষে তর্ক ক'রে বোঝাতে হবে যে, এ লোকগুলো বাইরে যা' দেখায় ভিতরে তার ঠিক উল্‌টো? এরা ইচ্ছা ক'রে দারিদ্র্যকে মাথা পেতে নিয়েছে ব'লে প্রচার করে, কিন্তু বাঁকা-পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে এবং বড়-বাজারে তুলোর খেলার আড্ডায় যেতে ছাড়ে না। এরা বিলাসিতাকে বর্জন করবার ভাণ করে, কিন্তু যখন সেটা বিনা পয়সায় হয়, তখন তাতে এদের কোন আপত্তিই থাকে না। তার সাক্ষী আমার সিগা-রেটের কৌটা এবং টয়লেটের দ্রব্যাদি। এগুলো থাকতো বাইরে রোগী-দেখবার ঘরেরই পাশে একটা ছোট কামরায়—এবং সেখানে তাদের অবাধ গতিবিধি লীনার খাতিরে আমায় সহ্য করতে হ'ত। বলতে ভুলেছি, কাপড়-চোপড় যতই নোংরা হোক, এদের চুলের পরিপাট্য ছিল অসাধারণ রকমের।

দেখলুম, তর্কে কিছুই হবে না—লীনার উপর এদের প্রভাব ধীরে ধীরে বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিলেতে থাকতে ডাক্তারী বিদ্যার সঙ্গে, পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে, মনোবিজ্ঞানের নূতন অঙ্গগুলোরও কিছু চর্চা করতে হয়েছিল। তাইতে বুঝেছিলুম, লীনা একটা Complex-এ অভিভূত ছিল। নানা কারণে কিশোর বয়স থেকে সে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে ফুটতে পায়নি। নিজেকে চেপে চেপে রেখে সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছিল যেখানে তার ব্যক্তিত্বকে তার নিজের পক্ষে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। লীনার মনীষা, অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি সাধারণ স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না; কিন্তু নিজের উপর

বিশ্বাসের অভাবে এর কোনটাই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে নি। যে যা' জোর ক'রে বলত, তাই সে মেনে নিত, এবং কয়েক দিন পরে সেটা তার নিজের কাছে নিজেরই মত ব'লে মনে হ'ত। ভিতরে ভিতরে সে একটা আত্যন্তিক দীনতার ভাব পোষণ ক'রে রেখেছিল। তাই যে-কোনও লোকের সামান্য মাত্র অনুরাগ, শ্রদ্ধা বা স্তুতিবাদ তাকে চঞ্চল ক'রে তুলত এবং কৃপণের মতো সকলকার চোখের আড়ালে সে সেগুলো সঞ্চয় ক'রে রাখত। সে সকলকেই খুশী রাখবার চেষ্টা করত এবং তার মূলেও ছিল এই ভাবটা। সর্বোপরি তার হৃদয়টি ছিল স্নেহ-কোমলতায় ভরা। তাই এই খদ্যোতিগণের তথাকথিত দুঃখের জীবন সংসারের নিষ্ঠুরতার নিদর্শনরূপে তার কাছে প্রতিভাত হ'ত। আমি এই সব জেনে কখনো নিজের মতামত জোর ক'রে তার উপর চালাবার চেষ্টা করিনি। সেটা অত্যন্ত সহজ ছিল ব'লেই করিনি। আমি চেয়েছিলুম, সে তার নিজের রকমে নিজে ফুটে উঠুক। কে জানত যে, আমার বদলে এই অপদার্থগুলোর মনের প্রভাব তাকে এত শীঘ্র অভিভূত করবে?

ভাবলুম লীনাকে এদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে গেলে এদের স্বরূপটা লীনার সামনে ব্যক্ত ক'রে দেখাতে হবে। কথায় নয়, কাজে। ভাইফোঁটার দিনকয়েক আগে লীনাকে বললুম—তুমি তো ওদের সকলকারই দিদি, দেবী ইত্যাদি। এবার ওদের ভাইফোঁটা পাঠালে কেমন হয়? লীনা মহা উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং ভাইফোঁটা উপলক্ষে এই ক'টি প্রাণী কাপড়-চাদর ইত্যাদিতে এত জিনিষ পেলে যা' তাদের নিজের উপার্জনে কখনো হ'ত কিনা সন্দেহ এবং যা' তারা সম্বৎসর ধ'রে নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যবহার করতে পারবে। খদ্যোতের জন্য লীনা বিশেষ করে নিজের হাতে তৈরী-করা জামা পাঠালে। বললে, আহা, ও বেচারার টাকা নেই, ক'রে দেবারও কেউ নেই!

যা' ভেবেছিলুম, তাই। দু'একদিনেই এদের সব ভোল্ ফিরে গেল! মোটা এবং নোংরা পরিধেয়ের প্রতি আসক্তিটা যে কোথায় অন্তর্দ্ধান করলে তার ঠিকানাই পাওয়া গেল না। তার বদলে গন্ধদ্রব্য, বিলাতী রূপটান প্রভৃতির উপর আসক্তিটা হঠাৎ এত ভয়ঙ্কর ভাবে দেখা দিলে যে, তাতে আমিও চমৎকৃত না হয়ে থাকতে পারলুম না। খরচটা পরোক্ষে আমাকেই জোগাতে হ'ত তো।

লীনা খাওয়াতে ভালবাসত। এদের সভা বসবার দিনে লীনা নিজের হাতে নানা রকম সৌখীন খাবার তৈরী ক'রে এদের খাওয়াত। পরিবেশনের জন্যে কুমারটুলী থেকে বিশেষ ক'রে মাটীর থালা এবং গেলাস আনতে হ'ত পাছে এদের স্বাদেশিকতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আমার বরাবরই মনে হ'ত, এতে এ হতভাগ্যদের পেট ভরলেও মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না এবং বিলাতী দোকানের মিষ্টান্নে কি বিলাতী খানায় এদের কিছুমাত্র বিতৃষ্ণা নেই, শুধু আদব কায়দা না জানার দরুণ এরা এই সব ভাণ করে। কিছুদিন পরে দেখলুম আমার অনুমানই সত্য। আমার কাছে উৎসাহ এবং শিক্ষা পেয়ে এরা দিনকতকের মধ্যেই বিলাতী খানায় এমন পরিপক্ক হয়ে উঠল যে পরিবেশকের কেতাদুরস্ততার লেশমাত্র অভাবও এদের নজর এড়াত না এবং খাবার টেবিলেই সমস্বরে চীৎকার ক'রে এরা তার ভ্রম সংশোধন ক'রে তবে ছাড়ত। আমার এতে যতই মজা বোধ হ'ত লীনা ততই রেগে উঠত। রাগটা হ'ত আমারই উপর—আমি লোভ দেখিয়ে এদের আদর্শ ভ্রষ্ট ক'রছি ব'লে।

লীনার চোখ খুলছিল, কিন্তু সত্যের আলো প্রথমটা সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজী হ'ল না। সে নিজে টেবিল ছেড়ে মাটীতে খাওয়া আরম্ভ ক'রলে। রেশমের কাপড়-জামা জলাঞ্জলি দিয়ে মোটা সূতোর বিশ্রী রং করা কাপড় পরা সুরু ক'রে দিলে। কিন্তু কিছুতেই কিছু

হ'ল না। তার ভক্তের দল এগুলো আর মেনে নিতে পারলে না। তারা নিজেরাই পরিহাস-অনুযোগ জুড়ে দিলে; খদ্যোৎ কিন্তু এ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। সে লীনার তালে ঠিক তাল রেখে চলছিল।

কিন্তু ভাঙ্গন যখন ধরে, তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা দুষ্কর। লীনা শত চেষ্টা ক'রেও তার ভক্তবৃন্দকে আর বেঁধে রাখতে পারলে না। তাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে আসছিল।

বলতে ভুলেছি, এই সভার উপলক্ষ্য ক'রে লীনার বিবাহিত এবং অবিবাহিত সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের এখানে আসত। তাদের আসবার দিনে দেশমাতৃকার শ্রাদ্ধটা মুলতুবি থাকত। সেদিন শুধু সাহিত্য-চর্চ্চাই হ'ত। কিন্তু সেটা নামে। আসলে সেটা গানবাদ্যেই পর্য্যবসিত হ'ত। এই মহিলাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজনকে খদ্যোৎ-ভাবের নারী প্রতীক ব'লে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই সহপাঠিনীটীর ইচ্ছামতই একদিন এদের গানের সন্ধ্যাটী "সার্থক" ক'রে তোলবার আয়োজন হ'ল। এবং সেই সূত্রে গোড়া থেকেই কি একটা মনোমালিন্যের সূচনা হয় যে-জন্য সেদিনের অধিবেশন স্থগিত রাখতে হয়। ব্যাপারখানা আমার কাছে এখনও রহস্যময় হয়ে আছে। আমি ওদের সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতুম না, সে দিনও ছিলুম না। তার পরদিন কোনো সূত্রে কথাটা শুনে মনটা এত বিরক্তিতে ভ'রে গিয়েছিল, যে আমি সেই দিনেই ঘরটা থেকে ওদের সভার জিনিস পত্র বার ক'রে দিয়ে সেটা নিজে দখল ক'রে বসলুম। লীনা এতে কিছুই আপত্তি করলে না—কি ভেবে তা' বুঝতে পারলুম না।

এই সূত্রে খদ্যোতের দল বিদায় নিলে, কিন্তু খদ্যোত নিজে রয়ে গেল। সে আর কিছু না জানুক টিঁকে থাকবার আর্টটা খুব ভাল-রকম ক'রেই শিখেছিল। লীনার দেবীত্বের দোহাই দিয়ে এবং

আমাকে খোস মেজাজে রেখে সে তার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখলে। কিন্তু তাকে এভাবে রাখতে আমার যে কত টাকা খরচ হচ্ছিল, তা' আমার তখন কোন ধারণাই ছিল না। লীনাকে উৎসর্গ-করা তার একখানা কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরোল—সেটা যে আমারই খরচায় তা' পরে জেনেছিলুম। বইখানা পদ্য কি গদ্য এবং তার ভাষাটা বাংলা কি আর কিছু—তা' আজ অবধি ঠিক করতে পারিনি। আমার কাছে বইখানা তো অসম্বদ্ধ পাগলের প্রলাপ ব'লেই মনে হয়েছিল। তবে এ বিষয়ে আমার মতামতের হয় তো কোনো মূল্য নেই। ডাক্তারী হিসাবে বাতুলতার অনেকগুলো দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তবে সাহিত্যের দিক দিয়ে পরিচয় সেই প্রথম। অতএব আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক, বইটা নিয়ে খদ্যোতের বন্ধুমহলে একটা সাড়া প'ড়ে গেল এবং তাকে একটা অভিনন্দন-ভোজ দেবার প্রস্তাবের কথাও শুনেছিলুম। তবে সেটা হয়েছিল কিনা জানি না এবং লীনা তাতে যোগ দিয়েছিল কিনা, তাও খোঁজ করিনি। বইখানাতে নিতান্ত খোলাখুলি রকমের বস্তুতান্ত্রিকতা ছিল না, তাই রক্ষা। পরে জেনেছিলুম লীনার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই সেগুলো বাদ দিতে হয়েছিল।

কিন্তু এই বইখানা বেরোবার পর থেকেই খদ্যোতের প্রতিভা একটা ভিন্ন দিক আশ্রয় করলে। তার দল ভেঙ্গে গিয়েছিল, অতএব কলা-চর্চ্চার তেমন সুবিধে ছিল না, তাই তাকে একটা নূতন দল খুঁজে নিতে হ'ল। সহরে হুজুকের অভাব কোনো কালেই নেই। সে সময় একদল শ্রমজীবির ধর্ম্মঘট চলছিল এবং সেই উপলক্ষে রোজই কোথাও না-কোথাও মিটিং হ'ত। খদ্যোৎ তাদের একজন নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠল। খদ্যোৎ গাইতে পারত মন্দ নয়। এখন প্রতি সপ্তাহে একটা ক'রে নতুন গান রচনা করত আর মিটিংএ সেটা নিজেই খুব

উদ্দীপনার সুরে গাইত। এর জন্যে গান পিছু এবং গাড়ীভাড়া বাবদ তার কিছু কিছু উপার্জ্জন হ'তে লাগল। এসব ব্যাপারে মেতে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণেও একটা পরিবর্ত্তন এসে গেল। তার প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা এখন প্রকাশ্য প্রগলভতায় পরিণত হল। কথায় কথায় দেশমাতৃকার দোহাই দেওয়া এবং উঁচু গলায় তর্কশাস্ত্রের সূত্রগুলোর মুণ্ডপাত করা তার এখন প্রকৃতিগত হয়ে দাঁড়াল। এ পরিবর্ত্তনটাতেও আমি বেশ আমোদ পেতে লাগলুম। কিন্তু খদ্যোতের সম্পর্কে আমোদ পাওয়া এইখানেই শেষ। এই আমোদ পাবার জন্যে তাকে যে অনেকটা প্রশ্রয় দিয়েছিলুম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা' নইলে তার কথায় সস্ত্রীক একদিন ঐ রকম একটা ধর্ম্মঘটের মিটিংএ উপস্থিত হব কেন? সভায় একমাত্র মহিলা ছিল আমার স্ত্রী—অতএব দেশমাতৃকার প্রতিরূপ ব'লে কথায় যতটা সম্ভব সমস্ত বক্তার কাছে থেকে সে ততটাই সম্মান পেলে। আমি গিয়েছিলুম কি ভেবে জানি না, কিন্তু বাড়ী ফিরলুম একটা দুঃসহ ঘৃণার ভাব মনে নিয়ে। স্নান ক'রে তবে নিজেকে কতকটা শুদ্ধ বোধ করলুম।

খদ্যোতের সেদিন উৎসাহ দেখে কে? খাবার সময়—আজকাল সে প্রায় রোজই আমাদের সঙ্গে খেত—তার সে কী বক্তৃতা! কিন্তু অন্য দিনের মতো সেদিন তার কথায় একটুও আমোদ উপভোগ করতে পারলুম না। সেদিন এ লোকটা পূর্ববঙ্গে যাকে "সীমা দেওয়া" বলে, তাই দিয়েছিল। তার প্রগলভতা সত্যিই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লীনার ভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সেদিনকার সম্মানে সে বেশ একটু গর্ব অনুভব করেছিল—এই থেকে বোঝা যায় যে, খদ্যোতের সংস্পর্শে তার রুচিটা কি রকম পরিবর্তিত হয়ে আসছিল। খাবার সময় খদ্যোতের বক্তৃতার বাঁধি গৎগুলো—মনে হল—যেন তার কাছে কি এক অভূতপূর্ব বার্তা বয়ে নিয়ে

আসছে। একটা আসন্ন জয়ের পূর্বাভাস তার গণ্ডে ফুটে উঠছিল আর এই কথাবার্তার সময় তার চোখ দুটো যেন মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিল।

সেইদিন প্রথম আমার মনে একটা বিতৃষ্ণা ভাব এল। আমি নিজে আমার স্ত্রীর মনের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করিনি—তার কারণ আগেই বলেছি। সেই সুযোগে এই ভণ্ডামি এবং ন্যাকামির অবতার খদ্যোৎ আমার স্ত্রীর মনটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছিল। এত দিন দেখেও দেখিনি কিন্তু আজ সেটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। লীনা আমার সঙ্গে বড় তর্ক করত না কিন্তু অনেক সময় দেখিছি আমার ইচ্ছা অনুসারে কাজও করত না। খদ্যোতের সামান্য ইঙ্গিতে কিন্তু সে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। এই সত্যটা সেদিন আমার কাছে নূতন ভাবে দেখা দিলে। এর ভিতর ঈর্ষার ভাব হয়ত ছিল কিন্তু তাতে লজ্জিত হবার কারণ কিছু দেখিনি। পুরুষকে ঈর্ষা সম্বন্ধে লজ্জিত হওয়া নারীই শিখিয়েছে—নিজের কার্যোদ্ধারের জন্য। আমার তাই বিশ্বাস ছিল এবং সে বিশ্বাসটাকে চাপা দেবার মতন দুর্বলতা আমার ছিল না। স্থির করলুম লীনাকে খদ্যোতের প্রভাব থেকে মুক্ত করতেই হবে। এটা আমার শুধু মনের ইচ্ছা নয়, আমার কর্তব্যও।

সেই রাত্রেই মফঃস্বল যেতে হ'ল সপ্তাহ খানেকের জন্যে। পথে ভাবতে লাগলুম, লীনাকে কি ক'রে খদ্যোতের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায়।

ফেরবার দিন ট্রেণে এক খবরের কাগজে দেখলুম—একটা বিরাট শ্রমজীবি-সভায় ডাক্তার নরেশচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী লীনা দেবী খদ্যোৎ-লিখিত এক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পাঠ করেছেন। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ডাক্তার নরেশচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে দেশের

সমস্ত নরনারীকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্যে আহ্বান করা হয়েছে।

এটা প'ড়ে আমার যে কী ভয়ানক রাগ হয়েছিল, তা' কথায় ব্যক্ত করা যায় না। বুঝলুম, আমার অনুপস্থিতিতে খদ্যোৎ লীনাকে এই সব হুজুকের আসরে নামিয়েছে। রাগটা দমন করতে অনেকটা সময় গেল। ইতিমধ্যে কি করতে হবে, তাও ভেবে নিলুম। কোলকাতা পৌঁছে ষ্টেশন থেকেই একেবারে বুটিদা'র বাড়ী গিয়ে উঠলুম।

বুটিদা' একটা নূতন কেশতৈল বা'র করেছিল, তারই প্রশংসা-পত্র ছাপাবার সম্পর্কে সে তখন ব্যস্ত ছিল। আমায় দেখে বললে—আপনার নামেও একখানা ছাপিয়ে নিয়েছি। আপনি তো এখানে ছিলেন না তাই অনুমতি নেবার অবসর পাইনি। জানি, আপনি কোন আপত্তি করবেন না। কিন্তু খদ্যোৎটার কি ব্যবহার বলুন দিকিন। বলে কিনা, নগদ পাঁচটি মুদ্রা না পেলে ও একটা প্রশংসাপত্র লিখে দেবে না। এর নাম কি বন্ধুত্ব? আপনিই বলুন তো।

বললুম—ওসব শুনতে আসিনি। তারপর আমার যা' বলবার ব'লে জিজ্ঞাসা করলুম—লীনা তোমার স্নেহের পাত্রী ব'লেই জানি। তাকে এই সব প্রভাবের মধ্যে আনা-র মূল হচ্ছ তুমি। এখন এসব থেকে তাকে বাঁচাতে কোনও সাহায্য করতে পার কিনা?

বুটিদা' খানিকক্ষণ ভেবে বললে—হ্যাঁ, খদ্যোৎটা আজকাল বেজায় বাড় বেড়েছে। আচ্ছা, আমি এর বিহিত করব।

বাড়ী ফিরে এসে লীনার কাছে সভার কথা কিছুই তুললুম না। কিন্তু দু'জনেই বুঝতে পারলুম যে, পরস্পরের মনে এই কথাটাই বড় হয়ে জেগে আছে। লীনার ভাবটা দেখলুম একটু সঙ্কুচিত রকমের। সে বোধ হয় পরে বুঝেছিল, কাজটা ঠিক হয়নি।

দিন তিনেক পরে লীনার নামে এক চিঠি এল। চিঠিখানা খদ্যোতের স্ত্রীর লেখা। তিনি লিখেছেন—অনেকদিন তাঁর স্বামী বাড়ী আসেন নি। লীনা দেবীকে তাঁর স্বামী অতীব শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তা' তিনি শুনেছেন, অতএব যদি লীনা দেবী স্ত্রীর কষ্ট বুঝে তাঁর স্বামীকে দিনকতকের জন্য দেশে আসতে বলেন, তা'হলে তিনি লীনা দেবীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবেন। তাঁর নিজের জন্য নয়, ছেলের হাতে খড়ি হবে, সে সময়ে তার পিতার অনুপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। নিজে কুরূপা ব'লে স্বামীসুখ থেকে বঞ্চিতা, কিন্তু তাই ব'লে ছেলে তো কোন অপরাধ করেনি। তিনি নিজের জন্য কিছু ভিক্ষা চান না, ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর শ্বশুর বাড়ীর অবস্থা ভাল, বড়-লোক না হ'লেও তাঁরা পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। যদি দয়া ক'রে লীনা দেবী তাঁর স্বামীকে বুঝিয়ে দিনকতকের জন্যও পাঠিয়ে দেন ইত্যাদি।

লীনা চিঠিখানা প'ড়ে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। এ কথনই সত্যি নয়, সত্যি হ'তে পারে না। খদ্যোৎ অতি দরিদ্র, সংসারে তার স্ত্রীপুত্র কেউ নেই। এ সমস্তই তার কোন শত্রুর কারসাজি। এ চিঠি জাল। এটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলা উচিত এবং এর কথা খদ্যোৎকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেওয়া হবে না। তাতে তাকে অপমান করা হবে।

চিঠিখানা আমাকেও কম আশ্চর্য ক'রে দেয়নি। তবুও শান্ত-ভাবে স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললুম—যদি এখানা বেনামী চিঠি হ'ত, তা'হলে তুমি যা' বলছ সেই মত ব্যবস্থাই সঙ্গত। কিন্তু এ চিঠিতে স্পষ্টাক্ষরে নাম-ঠিকানা দেওয়া আছে। যদি এটা জাল হয়, তা'হলে প্রথমেই এটা খদ্যোৎকে দেখান উচিত। সে হয়ত এ থেকে একটা সন্ধান পেয়ে অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে।

লীনা এ যুক্তির সারবত্তা বুঝলে। বুঝে, গম্ভীর হয়ে রইল। কিন্তু খদ্যোৎ আসতেই ব'লে উঠল—দেখুন, আমি আগে থেকেই ব'লে রাখছি, এ চিঠির কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। এ আপনার কোনো শত্রুর কাজ - আমাদের চক্ষে আপনাকে হীন, মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবার চেষ্টা।

খদ্যোতের সে কথা কাণেই গেল না। হস্তাক্ষর দেখে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিছল। চিঠিটা পড়তে পড়তে আমাদের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে সে উদ্যত-মুষ্টি হয়ে বলতে লাগল—এ সেই বুটির কাজ। বুটি ছাড়া আমার ঘরের কথা কেউ জানে না। সে-ই আমার স্ত্রীকে দিয়ে লিখিয়েছে। এতটা বিশ্বাসঘাতক হবে—তা' কখন ভাবিনি। ফাণ্ডের টাকার ভাগ পায় না, সে কি আমার দোষ? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব।

তারপর চিঠিখানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে কোনও দিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লীনা প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চল শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তারপর দিন থেকে লীনার একেবারে ভাবান্তর দেখলুম। বেচারী একেবারে মুশড়ে গিয়েছিল। এমন নম্র-কোমল ভাব, আমার সামান্য ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যে এমন ব্যগ্রতা লীনার এর আগে কখনো দেখিনি। অবশ্য এটা লক্ষ্য করেছিলুম, আমাদের মনোমালিন্য সত্ত্বেও, সে কখনো গৃহকর্মে বা সেবাযত্নে অমনোযোগী হয়নি। কিন্তু এখনকার ভাব সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মাঝে মাঝে এমন দীনকরুণ দৃষ্টিতে চাইত, যেন সে আমার কাছে কত অপরাধী, যেন সে মনের সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে পাছে ব্যথা লাগে, আমি তাই এসব কথা মোটেই তুলতুম না। সেও নিজে থেকে কিছু বলত না। আশা ছিল, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিনের পর

দিন কেটে যেতে লাগল, লীনার মনোভাবের বৈলক্ষণ্য দেখলুম না। একটু চিন্তিত হয়ে উঠলুম। একদিন দেখি—সন্ধ্যার সময় জানালার ধারে লীনা একাকী ব'সে কাঁদছে। সে দেখতে পাবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই দিনই মনস্থির করলুম। বেচারী লীনা!

খদ্যোৎকে খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সে ইতিমধ্যে একটা থিয়েটারে গান শেখাবার কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা ক'রে বললুম—আমার নিজের সময়াভাব, অতএব আমার স্ত্রীকে গান শেখাতে এবং তার সঙ্গে গল্প করতে তোমাকে রোজ আসতে হবে, আগে যেমন আসতে। তার ইতস্তত ভাব দেখে আরও বললুম—তোমার এখানকার ষাট টাকা মাইনের বদলে আশী টাকা ক'রে পাবে। তার চেয়ে বেশী চাও, তাও পাবে। কিন্তু যদি "না" বল, তা'হলে—হাতের ম্যালাকার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

পরের দিন থেকে খদ্যোৎ পূর্বের মতো রোজই আসতে লাগল। লীনা প্রথমটা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। তাদের কথাবার্তা আর জমল না—তাদের দুজনের মধ্যে এই ক'দিনের ভিতরেই একটা বিপুল ব্যবধান রচিত হয়ে গিয়েছিল। উভয়ে উভয়ের কাছে যত সহজ হবার চেষ্টা করতে লাগল, ব্যবধানটা ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। আমার চেষ্টাতেও এটা ঘুচল না। লীনা খদ্যোৎকে এখন যতই দেখতে লাগল ততই সেই ব্যাপারটার সম্পর্কে খদ্যোতের নীচতা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল।

খদ্যোৎ সেটা দিনকতকের মধ্যেই বুঝতে পারলে; তার উপস্থিতিটা তাই ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে লীনার পীড়িত ভাবটাও কমে আসতে লাগল। এটাও লক্ষ্য করলুম যে, যেদিন খদ্যোৎ অনুপস্থিত থাকত, লীনা সেদিন বেশ-একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব

করত। এই অনুপস্থিতির দিনগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লীনা আমার কাছে সহজ হয়ে আসতে লাগল—ঠিক আগেকার মতো। এমন কি ক্রমশ আমাদের ভিতর খদ্যোতের বিষয় নিয়ে আলোচনাটাও বেশ সহজ হয়ে এল—যেটা একেবারেই হবার আশা করিনি। তার-পর ক্রমশ খদ্যোতের আসা একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেল। আমি আমার স্ত্রীর মধ্যে সেই আগেকার সরলমনা বান্ধবীকে ফিরে পেলুম!

এবং তারপর থেকে বেশ সুখেই আছি দুজনে।

আরেক দিক

১

তার নাম ছিল মিনা।

সে ছিল বিধবা; সে ছিল যুবতী; এবং সে ছিল সুন্দরী। তার গায়ে থাকত লেস্-বিরহিত শাদা ব্লাউজ ও পরণে থাকত পাড়-বিহীন শাদা রেশমের শাড়ী। বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে তার ব্রহ্ম-চর্যের লেশমাত্র ছিল না—অর্থাৎ সে সাবান মাখত, পান খেত এবং বেশ প্রসন্ন মনেই বিকালে ছাদে বেড়াত।

তার উপর সে ছিল বড়লোকের মেয়ে।

অতএব পাশের বাড়ীর মেসের ছেলেরা যে তার বিষয়ে পাঁচরকম ভাববে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই।

কিন্তু তাদের, অন্তত তাদের মধ্যে একজনের ভাবনাটা যদি ভাবনাতেই থেকে যেত এবং লোভটা যদি ছাদের উপরে মিনা-কে দেখেই চরিতার্থ হ'ত, তা'হলে আর কিছু হোক আর না হোক, আমার এ গল্পটার সৃষ্টি হ'ত না।

চিন্তা এবং কাজ, এ দুটোর মধ্যে যে বেড়াটা আছে, সেটা মেসের এক যুবক হঠাৎ একদিন ভেঙে দিলে এবং তার ফলে মিনা-র হাতে একখানা চিঠি এসে পৌছল। চিঠিটা প'ড়ে তার মুখে যে একটা লালিমার আভা দেখা গিছল, সেটা রাগে কি অনুরাগে—তা' বলা বড় কঠিন; কেন না নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা' জানবার সম্ভাবনা নেই। এটা শাস্ত্রের বচন, অতএব সত্য।

কিন্তু যখন রোজ একখানা ক'রে চিঠি আসতে লাগল তখন মিনা-র গণ্ডে লালিমার সঙ্গে ভ্রুযুগলেও কুঞ্চিত-রেখা ফুটে উঠতে লাগল। এর থেকে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেন না ভ্রুকুটি বিরক্তির লক্ষণ। এটাও অলঙ্কার শাস্ত্রের বচন, অতএব গ্রাহ্য।

স্ত্রীলোকের সংসার জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তার উপর মিনা আজন্ম কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বর্ধিত। অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেস্‌-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্য কি। কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটাও ও পক্ষের চেয়ে এ পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল। সেইজন্যই মিনা-র মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রণ একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনা-র নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা যায়নি।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদিদি চিঠি লিখলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি যে ছোকরার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশ্রয় দিও না। তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। বড়্‌-ঠাকুরকে ব'লে তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো।" চিঠিটা প'ড়ে মিনা-র মুখে একটুও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। সে উত্তরে লিখলে, "তার দরকার হবে না, বৌদি, আমি নিজেই তাকে শিক্ষা দিতে পারব।"

২

দু' দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরায় চিঠি লিখলে—

—তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্যে সত্যিকারের জলখাবার সাজিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢুকে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে

গিছল—বসবে কি দাঁড়াবে, নমস্কার করবে কি না-করবে—কিছুই ঠিক ক'রে উঠতে পারছিল না। আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিতেই সে একখানা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ভোজন সুরু করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঙ্গী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ—এর মধ্যে কোন্‌টা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা' বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই "তুমি" সম্বোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেও না। ও-সম্বোধন সম্বোধনটা প্রেমাস্পদেরই একচেটে নয়; বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সমপদস্থ বাইরের লোকেরও ও-সম্বোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু "তুমি" বলতে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় "আজ্ঞে" বলে ভণিতা করছিল। হ'রে চাকরের চেয়ে সভ্য বটে—সে "এজ্ঞে" বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক, তার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা শুনিয়ে দিলুম। তার নাম গোবর্দ্ধন কি জনার্দ্দন, কি ওই রকম একটা কিছু। তবে যে চিঠিতে "দিব্যেন্দুসুন্দর" ব'লে সই করা ছিল—তার কারণ আর কিছুই নয়—কোলকাতার মেয়েরা সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না ব'লে। আমার সম্বন্ধে তার ইচ্ছাটা ছিল শুভ;—অর্থাৎ ডাক্তারি কলেজের ছেলে হ'লেও আমার উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করবার ইচ্ছা তার কোন কালেও ছিল না অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে ডাক্তারখানা খোলবার মৎলবও তার মনে কখনো ওঠে নি। আমাকে তার বিয়ে করবারই অভিপ্রায় ছিল। ব্যাপারটা একবার কল্পনা করো দিকিন্। একটা এঁদো গলির ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী—তার মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন-নামা স্বামী-দেবতার সঙ্গে আজীবন বাস। হাঁটুর-উপর-ওঠা কাপড় প'রে প্রত্যহ তাঁর বাজারে গমন এবং বাজার থেকে ফিরে এসে মুটের সঙ্গে এক পয়সার

হিসেব নিয়ে বাকযুদ্ধ!…তাকে তার সদভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ দিলুম। তবে বললুম বিয়ে হয় কি ক'রে?—বিধবার বিয়ে হ'তে গেলেও জাতটা তো ভিন্ন হ লে চলবে না। সে বললে—কেন, আপনারা তো আমাদের পাল্‌টি ঘর। বললুম—তা' হ'তে পারে, কিন্তু তবুও তো এক জাত নয়। কেন যে নয়, সেটা তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অবস্থার তফাৎটাই যে আসল জাতের তফাৎ—অন্তত আমার যে তাই ধারণা—তা' এই বিশ্ববিদ্যা-লয়ের শিক্ষিত যুবকটির মস্তিষ্কে শেষ পর্যন্ত ঢোকাতে পেরেছিলুম কিনা সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। সে তো এক মহা বক্তৃতা জুড়ে দিলে—খুব উচ্ছ্বাসময় এবং খুব সম্ভব আগে থাকতে মুখস্থ করা। তার মোদ্দাখানা এই যে, প্রেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা প'ড়ে যায়। এ হচ্ছে আসলে যেটা প্রশ্ন, সেটাকে উত্তর বলে মেনে নেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে ওটা জ্ঞানের অভাব কি প্রেমের স্বভাব—সেটা বুঝতে পারলুম না। বললুম—কাল্‌চারের বৈষম্যে প্রেম তো জন্মাতেই পারে না—অন্তত জন্মান উচিত নয়। সে তখন একটু গরম হয়ে বললে—"আপনারা আমাদের নিতান্তই অসভ্য বাঙাল, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূত ব'লে মনে করেন—না?" আমি বললুম—"শুধু যে মনে করি তা' নয়, মুখেও বলি। তবে জ্যান্ত মানুষকে 'ভূত' না ব'লে 'অদ্ভুত' বলি।" সে ততক্ষনে মহা রেগে উঠেছে। বললে—"আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে কি? আমিও যদি জানিয়ে দি' যে, আপনি আজ আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছেন, তাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায়?" এ ধরণের লোকেদের ভদ্রতার মুখোসটা কত সহজে খ'সে পড়ে দেখছ! তার যা' প্রতিকায় আমার হাতে ছিল—সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শান্তভাবেই বললুম—"প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গন্ধটা থেকে

যায় এবং ও-জাতের গন্ধের উপর আমার একটা চিরকেলে বিতৃষ্ণা আছে। অতএব আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না রেখেই সে পলায়ন দিলে। ভাগ্যিস জলখাবারটা খেয়ে গিছল—তা' নইলে বেচারার কি কষ্টই না হ'ত!

৩

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুসুন্দর ওরফে গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন সকলকে জানিয়ে দিলে যে, সে তার পরদিনই দেশে ফিরে যাবে কারণ এখানে তার "নোনা" লেগেছে। কোলকাতার জল খারাপ, হাওয়া খারাপ, কোলকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পরদিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে কোলকাতা একেবারেই ত্যাগ ক'রে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি ক'রে খাবে তবু আর কোলকাতায় ফিরবে না। সেখানে তার একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি! সে একরকম জোর ক'রেই পালিয়ে এসেছে। কোলকাতার লোকেরা সব করতে পারে! আর তাদের মেয়েদের তো জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।"

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, "আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিস, ভাই। লোকটার কি আস্পর্দ্ধা!" ননদ আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও পড়ল, বোধ হয়।

রেলপথে

বোতলটা দেখেই চম্‌কে উঠলে ভায়া—তবুতো এখনো পেটে পড়েনি।...আর যাই কর, ভুরুটা অমন ক'রে কুঁচকে থেকো না।... কি জানি, আমি তোমাদের সভ্যতাটা ঠিক হজম করতে পারিনি।—বয়সটা নেহাৎ কম হয়নি—তবু ওই 'আপনি' বলাটা সব সময় আসে না। হাজার হোক, তুমি বয়সে অনেক ছোট, আর জানইত ভায়া, মাতালদের দিল্‌টা একটু খোলা-খালা হয়েই থাকে।...হ্যাঁ, ওই বাঁ-দিকের পর্দাটা একটু নীচের দিকে টেনে—ব্যস্‌। এইবার একটু ভদ্রস্থ হয়ে বসা গেল। সর্দির ধাত,—বৃষ্টি-টিষ্টি বড় সহ্য হয় না। তাই দেখ না সোডার মাত্রাটাও কত কম।...না, দাদা, ভুল করলে; ওটা পাকা মাতালের লক্ষণই নয়—নেহাৎ পেঁচিরাই একেবারে raw টানে। তবে কি জান, গেরস্তর সংসার—একটু রয়ে-ব'সে হাতে রেখে খরচাটা করা ভাল।...আঃ দয়াময়ী...না, আর একটু সোডা লাগবে দেখছি—মালটা বড় সুবিধের নয়।... তবুও খাই কেন? সেটা বুঝতে গেলে দরদী হওয়া চাই, ভায়া। টিটির দলের নওতো?...বাঁচলুম। তোমার মুক্তির আশা আছে। ওই মাদক-নিবারণী দলে ঢুকেছ কি মরেছ। যত নামজাদা মাতাল দেখছ—সব ছিল এক সময়ে টীটির দলে। হ্যাঁ, লিভার টিভার হয়, তখন নয় ও দলে নাম লেখাও, আপত্তি নেই। কিন্তু গোড়া থেকে গেছ কি মরেছ।...আর একটা গ্লাস বার করি?...এ জিনিসটা চলবে না? কি করব ভাই, নেহাৎ গরীব—নিজের খরচে এ-মার্কাটার উপর আর উঠতে পারি না। তবে হাঁ, কোলকাতায় এর চেয়ে ভাল

খাই বটে,—সেটা পরস্মৈপদী কিনা। হাঃ হাঃ হাঃ। জানইত, যাঁদের বাড়ীতে থাকি, তাঁরা হ'লেন বড় লোক, আত্মীয় কুটুম্বেরাও সব পদস্থ—খারাপ খেলে তাঁদের বেখাতির হবে যে!—বিশেষ খরচটা যখন তাঁরাই যোগান। তাঁদেরই একজনকে বললুম—চল হে, দার্জিলিংটা ঘুরে আসি। তিনি কানেই তুললেন না। কাজেই বোতলটা নিজের খরচে চালাতে হ'ল। না চালিয়ে আর উপায় কি? এই পাহাড়ি বৃষ্টির দেশে একটু আধটু না টানলে কি চলে? আর ওই পার্শী বেনেটা—কি দরই না চড়িয়ে রেখেছে।···না, দাদা, দার্জিলিংএর খুরে দণ্ডবৎ। এই হরদম্ বৃষ্টি, তার ওপর বোতল মাগ্যির দেশে কেউ সখ করে আসে আবার!···নিজের খরচে বোতল চালানো—তা' সত্যি কথা বলতে কি ভায়া—ও ভাল মন্দ আমি বিশেষ বুঝি না। নেশা নিয়ে কথারে ভাই—যা-হোক একটা হ'লেই হ'ল।···হ্যাঁ, কি বলছিলুম? আমিও ছিলুম মাদক-নিবারণীর দলে। শুধু দলে? পাড়ায় যে ছোট-খাট সভাটা ছিল, আমি ছিলুম তার সভাপতি।...হাসছ নাকি, ভায়া? হাসবার কথাই বটে! তবে সব খুলে বলি শোন।···দাঁড়াও, আগে চুরুটটা ধরিয়ে নি। একটা চুরুট ধরাতে পাঁচটা কাটি···না, দাদা, তেমন পেঁচিই নই যে দু'চার পেগে হাত কাঁপবে। কি জান, সস্তার মাল মেহনতে যায়।.. বাড়ীর কেউ খান হাভানা। তাঁর সঙ্গে আমিও খাই হাভানা। লাগেও ভাল। মেসোম'শায় খান্ ত্রিচনোপলি। বলেন—এ-গুলো হাভানার চেয়ে ভাল। তাঁর সঙ্গে আমিও বলি ভাল। যখন বাড়ীর গণ্ডির বাইরে গিয়ে পড়ি—তখন খাই পানের দোকানের পয়সায় দুটো কড়া চুরুট। তাও মন্দ লাগে না। আসল কথা কি জান— ওই যা বলেছি—নেশার জিনিষ একটা হ'লেই হ'ল।···কি বললে? সখের জিনিসটা সব চাইতে সেরা হওয়া দরকার?—ও সব লক্ষ্মীছাড়া

চালিয়ে লোকের কথা শুনো না।···আরে ভায়া, তাই যদি হ'ত তা'হলে কি আজ এই দু'পয়সার সংস্থান ক'রে নিতে পারতুম? আমি বলি—নেশাটা কর, ক্ষতি নেই—কিন্তু তার সঙ্গে চোখ কান বুজে খরচটা বাড়িও না। যত পার পরের ঘাড়ে চালাও। নেহাৎ না চলে··· ওঃ সেই গোড়ার কথাটাই ভুলে গেছি! কেমন ক'রে মাতাল হলুম—শোন।

ছিলুম গরীবের ছেলে। করতুম মুন্সেফী আদালতের আমলা-গিরি। চেহারাটা নেহাৎ মন্দ ছিল না—এখনকার মত নয়! সে দিন আর আছে কি ভায়া, যে দিন এই চেহারার জোরেই।...যাক্ সে কথা। টাকার অভাব থাকলেও কৌলিন্যের অভাব কোন কালে হয়নি। গ্রমের যিনি জমিদার—তিনি ছিলেন আমার মাতুলের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়—অতএব আমারও বটে। তিনি যে অসমর্থ মাতুলের হাত থেকে আমাকে নিজের আশ্রয়ে সরিয়ে নিলেন একদিন, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। মানুষের বরাত এমনি ক'রেই খোলে হে ভায়া,—সেই আসল কথাটাই কিন্তু ভুলে গিছলুম তখন। তবে আত্মীয় বাড়ী যে জেলখানা হয়ে উঠবে সেটাও ভাবিনি কখনো। কলেজের ছুটির সময় ছোট বাবুরা বাড়ী আসতেন—থাকতেন নিজেদের গণ্ডীর ভিতর—আমাকে আমলই দিতেন না। আত্মীয়া সম্পর্কীয়ারাও তথৈবচ। অন্দরে আমার ডাক পড়ত শুধু তখন, যখন তাঁদের আমোদের উপকরণ প্রায় ফুরিয়ে আসত। আমলা-জন্মে সখের থিয়েটারে সখী সাজতুম। সেই সময়ের কতক-গুলো গান ভাবভঙ্গী দিয়ে গেয়ে তাঁদের মন জোগাতে হ'ত। কিন্তু তাতেও তাঁদের তাচ্ছিল্যের হাত থেকে রক্ষা পেতুম না।···যাই হোক, মোটের উপর মন্দ ছিলুম না। খাওয়া-পরাটা চ'লত ভাল। আর নেশা ভাংটাও যে না চ'লত—তা নয়। কাছারি ঘরে নায়েব

গোমস্তাদের সঙ্গে সিদ্ধি খেতুম। আর তাদের যখন কাজ থাকত, তখন দেউড়িতে দরোয়ানের সঙ্গে বসে গাঁজা টানতুম। এক রকম মজগুল হয়ে ছিলুম মন্দ না। তবে ওই অন্দরে গিয়ে খেতে হ'ত—এই যা এক হাঙ্গাম ছিল। খাবার সময় বাড়ীর গিন্নী মাতাঠাকুরাণী কাছে এসে বসতেন—আর আমি ঘাড় হেঁট ক'রে খেয়ে যেতুম। তিনি আমার নাম ক'রে বলতেন—ছেলেটি বড় লাজুক। মেয়ের দল ব'লত—লাজুক না ছাই—একটা জবু-থবু জানোয়ার। শুনতে শুনতে একদিন হয়ে গেল রাগ। সেদিন গাঁজায় দোক্তার ভাগটা একটু কম পড়েছিল—আর খেতেও দেরী হয়ে গিছল। রাগবার কথা নয়? জানোয়ার বটে? সেদিন যা' মুখ ছোটালুম তাতে আমার তথা-কথিত আত্মীয়াবৃন্দের মুখ লুকিয়ে পালাবার পথ রইল না। সেদিন তাঁদের চমক ভাঙল। আমার লুকিয়ে নেশা করবার কথা সব বেরিয়ে পড়ল; আর তার ফলে আমার কলকাতায় নির্বাসন আজ্ঞা হ'ল।···হাজার হোক তাঁদের আত্মীয় ব'লে পরিচয়টা তো বটে—তাঁদেরই নাম খারাপ হবে—আমার আর কি;—অতএব কলকাতায় আমার সভ্য করবার আয়োজন রীতিমত সুরু হ'ল। সকালে মাষ্টার এসে পড়াবে, দুপুরে মার্কার বিলিয়ার্ড খেলা শেখাবে, বিকালে শোফেয়ার বেড়িয়ে নিয়ে আসবে, আর রাত্তিরে খাবার পর ছোট বাবুদের কাছে সভ্যতার এগ্‌জামিন দিতে হবে। দেখলুম গতিক মন্দ। শিকলি কাটবারও উপায় নেই—না খেতে পেয়ে মরতে হবে। অতএব একেবারে পোষ মেনে গেলুম। এবং তার ফলে দিন কতকের মধ্যেই শিক্ষার বাঁধুনিটা আল্‌গা হ'য়ে এল। মাষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম—তাঁকে পড়াতে হবে না; তাঁর মাইনের অর্ধেক আমার, অর্ধেক তাঁর। শোফেয়ারটা ছিল একগুঁয়ে—সে ঠিক ধরা-বাঁধা রাস্তা দিয়ে নিয়ে

যাবেই—আমার হুকুমের তোয়াক্কা রাখত না। তখনকার মত চেপে গেলুম। কিন্তু পরে বাছাধনের চাকরীটি খেয়ে ছেড়েছিলুম। চোখ ক্রমশ খুলতে লাগল। দেখলুম এঁদের প্রভুত্ব-প্রিয়তাটা খুব বেশি। সেইটি বুঝলে মন জুগিয়ে চ'লতে আর কতক্ষণ, ভায়া? মাস কতকের মধ্যেই হাতের মুঠোর ভিতর এল সব। তখন আমি না হ'লে আর চলে না। আমাকে ছেঁটে ফেলে এমন কি বাবুদের সঙ্গে দেখা করবার যো-টি আর রইল না কারুর—তা' বাইরের লোকই কি আর বাড়ীর লোকই কি। হাজার হোক, ওঁরা হলেন বড় লোক—দিল্-দরিয়া মেজাজ—বাইরের লোক এসে দু'পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে যাবে আমি থাকতে? নিমকের তো একটা কদর আছে।··· ক্রমশ রোজের বাজার থেকে বাড়ীর ভিতরকার ফাই-ফরমাস, মায় গয়না গড়ানো, মাস কাবারি পাওনা চুকোনো—সবই আমার হাতে এসে পড়ল। তাতে আমার দু'পয়সার সাশ্রয়ও হ'ল। যাই বল ভায়া, পেটের জন্যই তো সব। সেই পেটটা না ভরালে চ'লবে কেন? হাত দিয়ে পয়সার লেন-দেন হবে—আর হাতে কিছু থেকে যাবে না—তা কি হয়? এ শর্মা তেমন গর্দভই নয়।··· চাকর-বাকরও সব বেজায় অনুগত হয়ে উঠল—আগের মত আর চোরাগোপ্তা পেজমো করতে সাহস ক'রত না—মাইনে আর চাকরি দুই যে তখন আমার হাতে। কাজে-কাজেই নেশা ভাংটাও চ'লত—কিন্তু খুব লুকিয়ে। তবে মদের স্বাদটা তখনো পাইনি—গন্ধ বেরোবার ভয়ে। তাও ক্রমশ হ'ল—কি ক'রে তাই ব'লব এইবার।··· আরে, এই যে কার্শিয়াং। এর মধ্যেই?···নাঃ, তুমিই যাও ভায়া। এক বাটী চা খেয়ে আমার এত দামের নেশাটা নষ্ট ক'রতে পারব না। নেমন্তন্ন বাড়ীতে দই খাই না ওই ভয়ে! কি জান—গেরস্তর ছেলে, ট্যাঁকের পয়সা খরচ ক'রে নেশা ক'রতে হয়। সেটা নষ্ট ক'রব

তোমার ওই ছাইভস্ম খেয়ে? তেমন পাত্তরই নই হে, ভায়া।... কি ব'ললি—এক টাকা? ওই কাঁচের মালাটা? বেটা খুব কাপ্তেন পাকড়েছিস দেখছি। ট্যাঁক আলগা হবে এমন নেশাই করিনারে বাপু।...এস হে, গাড়ী ছাড়ল ব'লে। ওই সাহেবদের মত একবার পায়চারি না ক'রলে চলে না? ওরা হ'ল গো-খাদকের জাত।... হ্যাঁ, পর্দাটা খোলাই থাক। বৃষ্টি তো আর নেই, আর হাওয়াটাও বেশ জমাটি গোছের।......

যা' বলছিলুম। বাড়ীর লোকেরা ত আমায় দিলেন পাড়ার মাদক-নিবারণী সভার সভাপতি ক'রে। হাজার হোক, তাঁদেরই আত্মীয় বলে তো পরিচয় দিতে হবে। একটা কিছু ওই রকম খোঁটা না থাকলে চ'লবে কেন? আমার পক্ষেও হ'ল ভাল...বাঃ এর মধ্যে ভণ্ডামিটা পেলে কোথায়? মদটা তো ধরিনি তখনও। আর মাদক-নিবারণীরা মদের ওপর এতটা ঝোঁক দিত যে বাজারে মদ ছাড়াও যে একচল্লিশ রকমের নেশা আছে তার খবরই রাখত না। কাজেই মাদক-নিবারণীর সভাপতি হ'তে আর আপত্তি কোথায়?...যাই হোক, বক্তৃতা দিতে তো আর খরচ লাগে না। আর মাষ্টারটাও ছিল হাতের কাছে। সেই সব লিখে-প'ড়ে দিত। তবে এই যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো—এর মজুরী পোষানো চাই তো—তাই সভার তহবিলটা নিজের হাতে নিলুম। তাতেও দু'পয়সার সংস্থান হ'তে লাগল।...কি ব'ললে—conscience? ওই তোমাদের একটা রোগ। আগে তো ছিল না ওটা এদেশে। শুনেছি মার্টিনো ব'লে কে-একজন ওই রোগটার বীজ কেতাবের ভিতর ক'রে এদেশে পাঠিয়ে দেয়।...না ভায়া, আমি ও রোগে কখনো ভুগিনি।...যাই হোক, নামটা একটু জাহির হবার সঙ্গে-সঙ্গে সভার ছোট ঘরটা ছেড়ে কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা সুরু করলুম।...

এইবার আসল কথাটা শোন।—একদিন ওই রকম বক্তৃতা দিচ্ছি—এক কলেজের ছোকরা আমার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। যত মনে করি তার দিকে চাইব না, ততই তার দিকে চোখ পড়ে, আর অমনি তার হাসির ফোয়ারা ছুটতে থাকে। শেষকালে আর থাকতে পারলুম না। 'বল্লুম—কি হে ছোকরা, মৎলবটা কি বল দিকিন? উত্তর দেবার আগে সে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালে। তারপর আমার মুখের উপর ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে—খুব তো বক্তৃতা দিলেন ম'শায়। কিন্তু নেশা না ক'রে থাকতে পারেন?—ব'লে সে নিজেই এক বক্তৃতা জুড়ে দিলে। ব'লতে লাগল—"নেশা না করে কে? দেবতারা করেন না? হেড্ দেবতা যিনি—দেবাদিদেব মহাদেব—তাঁর ত আবকারি এক-চেটে। স্বয়ং ভগবান, যাঁর মহাদেবের চেয়েও উঁচু পায়া, তিনি যে পয়লা-নম্বরের নেশাখোর তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে তাঁর এই সৃষ্টি কল্পনা। নেশা না ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় কি কেউ এমন এলোমেলো বেখাপ্পা সৃষ্টি ক'রতে পারে? নেশা? নেশা তো ছোট কথা—একেবারে delirium tremens অবস্থার রচনা এই সৃষ্টি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে ব'ললে—"নেশার খরচটা যদি নেহাৎ বাড়ীতে না জোটে তো আমরাই না হয় এবারটা চাঁদা ক'রে দি। একবার স্বাদ পেয়ে এসে তারপর বক্তৃতা দিও।"—এই শুনে তো তার দলের ছেলেরা হেসেই অস্থির, আর আমার দলের ছোকরারা চ'টেই লাল। মারামারি হবার উপক্রম হয় দেখে আমি আস্তে আস্তে স'রে পড়লুম। গেটের কাছে গাড়ি ছিল। দেখি গুণধর চালক ইতিমধ্যে একবার মির্জাপুরের তাড়িখানায় পায়ের ধূলো দিয়ে এসেছেন। মেজাজের আর দোষ কি বল? একেবারেই বিগড়ে গেল। নিজেই গাড়ি চালিয়ে বাড়ী এলুম। তাই কি বিপদ ছাড়ে ম'শায়? দরজায় পা

দিতে না দিতেই দেখি একটা ছোকরা দেয়ালের গায়ে কি একটা বিজ্ঞাপন আঁটছে। ডাকলুম—মধো, ছোঁড়াটার কান দুটো ধ'রে নিয়ে আয় তো—ওই কাগজগুলো শুদ্ধ। কাগজগুলো কেড়ে নেবার সময় ছোকরাটা মধোর হাত ছিনিয়ে পালালো। একটু দূরে গিয়ে ব'ললে—বাবু, মালটা ভাল, খেয়ে দেখবেন।...কাগজগুলো টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে দেখি যে, সেগুলো একটা ইংরাজী দোকানের একটা বিশেষ মদের বিজ্ঞাপন। মধোকে বল্লুম—ফেলে দে এ জঞ্জালগুলো। কিন্তু সে ফেলবে কি? ফেলবার আগেই নজরে পড়লো বিজ্ঞাপনে আঁকা এক ফরাসী সুন্দরীর মুখ। কি আকর্ষণী সে মুখের! বল্লুম—আপাতত থাক এগুলো এখানে। সুন্দরী পেয়ালাটা মুখে তুলেছে আর পেয়ালার কাঁচের ভিতর দিয়ে তার দুষ্টুমি-মাখা চাউনিটা ফুটে বেরিয়েছে। যে দিক দিয়ে দেখি—সে যে আমারই দিকে চেয়ে হাসছে! বল্লুম—মধো, নিয়ে যা এগুলো সামনে থেকে। তার চাউনিটা আমায় পাগল ক'রে তুলছিল আর কি! মধো বুদ্ধি খরচ ক'রে সেগুলো পিছনে নিয়ে গিয়ে রাখলে। খানিক পরে মুখ তুলে দেখি—সুন্দরী আর্শির ভিতর দিয়ে সেই রকম ক'রেই হাসছে। বল্লুম—মধো, বিদেয় কর্—বিদেয় কর্—এ যে আমাকেও মাতাল ক'রে তুলবে। মধো সেগুলো নিয়ে চলে গেল এবং পরক্ষণেই একটা বোতল হাতে ক'রে ফিরে এল। ব'ললে—হুজুর, জিনিসটা সত্যিই ভাল। বড বাবু এই জিনিস ছাড়া আর কিছু খান না। একবার দেখবেন কি?...আরে, এরা বলে কি? সমস্ত দুনিয়া আজ ষড়যন্ত্র ক'রেছে আমায় মাতাল ক'রবে বলে?...সিদ্ধিটা-আসটা খাওয়া যায়—কিন্তু এ যে মদ!...হ'লই বা মদ! কুচ্ পরোয়া নেই।...বল্লুম—ঢাল্।... কাঁচের গ্লাস মুখে তুললুম...আঃ মেজাজটা একেবারে জল হ'য়ে গেল। কি অম্ল-কষায়-মধুর স্বাদ সে!...বোতলের উপরেও আঁকা রয়েছে

আমার সেই ফরাসী সুন্দরী...আরো একপাত্র নিঃশেষ ক'রলুম। এবার সুন্দরীর মুখ ফুটল। ব'ললে—"আর ক'টা দিনই বা? একটু ফূর্তি ক'রে নাও। এই সুঠাম দেহ, বিলোল নেত্র, অধরে আঙুরের স্বাদ—দু'দিনেই চলে যাবে—তীরে ব'সে গুলিখোরের মত ভেবোনা—ঝাঁপ দাও, বন্ধু, ঝাঁপ দাও।"...আর একপাত্র—তারপর আরও একপাত্র।...এত মধু যে ছিপি-আঁটা কাঁচের বোতলে সঞ্চিত থাকে তা কে জানতো? তা' হলে কি গাঁজা-ভাং খেয়ে সময় নষ্ট করি?... হ্যাঃ, ওরা আমায় রিফর্ম ক'রবে—মদের খোরাক জুগিয়ে!...আরো একপাত্র...দেয়ালের ছবিগুলো বলে কি? এ বাড়ীর পূর্বপুরুষদের ছবি—নামাবলী গায়ে, হাতে হরিনামের ঝুলি, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, গলায় মালা, গোঁফ কামানো আমার দাদা প্র-দাদা-মহাশয়ের দল—তাঁরাও আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হাসি আরম্ভ ক'রলেন। ভাবখানা যেন—তাঁরাও এ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁদের মুচ্‌কি হাসির অর্থ—"ভায়া, আমরাও জানতুম কিছু-কিছু—শুধু হরিনামের মালা ঠুকেই জীবন কাটাইনি। সুখী হলুম—বড় সুখী হলুম, আমাদের বংশাচার তোমার হাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। এই তো চাইরে ভাই—নইলে পুরুষবাচ্ছা কিসের?"...তাঁরা ক্রমশঃ সোনালী ফ্রেমের গণ্ডি ছাড়িয়ে নেমে এলেন। পিঠ চাপড়ে বল্লেন—বহুৎ আচ্ছা। তারপর হরিনামের ঝুলি ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখালেন—দেখি তার ভিতর এক একটি বোতল দাঁড় করানো রয়েছে। চোখ টিপে বল্লেন—"ভায়া, সব দিক বজায় রেখে সবই চালাতে পারা যায়।—আজ তোমার পুনর্জন্ম হ'ল—আমরা তোমায় আশীর্বাদ করি। পূর্বজন্মের তুমি—যে গাঁজা-ভাং খেত—তার শ্রাদ্ধ ওই উঠোনে হচ্ছে দেখবে এস...বোতলটুকু নিঃশেষ ক'রে উঠে পড়লুম।...কী ফূর্তি! সমস্ত জগতে কী প্রাণের স্পন্দন!...সৃষ্টি? সে তো আমারই হাতে।...

জীবনের এই স্পন্দন, এই আনন্দ—ইতর লোকে যাকে বলে নেশা—এই ত সৃষ্টির পূর্ব সূচনা...আমিই তো আনন্দ-স্বরূপ—আমিই সৃষ্টি-কর্তা।...বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম।...উঠোনে সে কী কীর্তন রব! আমার সেই বোতলের সুন্দরীই যে দেখি সভার প্রধানা গায়িকা!...কী বিলোল ভঙ্গী! গাইছে—"রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা"—আর আমার দাদা-প্রদাদা-মহাশয়েরা ধূয়ো ধ'রছেন—"ঢালো, আরো ঢালো"। তাঁদের হরিনামের ঝুলি থেকে বোতলের মুখটা একটু বেরিয়ে রয়েছে। তাই থেকে গলাটা মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নিয়ে সুন্দরীর সুরে সুর মেলাচ্ছেন—"ঢালো, আরো ঢালো।"...আমায় তাঁরা ইসারা ক'রে ডাকলেন—ভায়া, এস—এই ত সময়।..আমার ফরাসী সুন্দরীও সুগোল সুন্দর বাহু প্রসারিত ক'রে গাইলে—"এস এস বঁধূ এস।"...কী আকুল আহ্বান সে! বিশ্বের প্রথম নারী পুরুষকে বোধ হয় এই রকম ক'রেই ডেকেছিল!...সে ডাক কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? ...সিঁড়ি দিয়ে নাব্‌তে তর্ সইল না—বারাণ্ডা থেকে ঝাঁপ দিলুম।...

জ্ঞানও হয়নি অথচ অজ্ঞানের ঘোরটাও কেটে গেছে—এমন অবস্থায় শুনলুম—ডাক্তার বলছেন—ভয়ের কিছু কারণ নেই, ভিতরটা ঠিক আছে। কে একজন ব'ললেন—গাঁজা-ভাংই খেত, শ্যাম্পেনের নেশাটা যে একেবারে মাথায় চ'ড়ে যাবে আশ্চর্য কি! আর একজন ব'ললেন—'যাই হোক এবারকার নেশার জিনিসটা একটু ভদ্রলোকের মতন।...

বাঃ এ যে শিলিগুড়ি! কখন্ যে তিনধরিয়া পেরিয়ে এলুম জানতেই পারিনি।...বুঝলে ভায়া—ওই থেকেই সুরু—তারপর সরকারী বৈঠকখানায় গিয়ে জমলুম আর কি!...থাম্ না, কাড়াকাড়ি করিস কেনরে বাপু?...কি বললি? ওই তিনটে বাক্সর জন্যে তিন আনা? আমায় ঠাউরেচিস কি? বাড়ী থেকে নয় গাড়ী-ভাড়াই দিয়েছে; মুটে ভাড়াটা যে নিজের ট্যাঁক থেকে দিতে হবে...নে—নে—চল্—চল্।

স্মৃতির জের

লণ্ডনের উত্তরাংশে উপন্যাস-প্রসিদ্ধ হাইগেট (Highgate)—এখন সহরতলীরই একটা অংশ। তারই মাজল্ হিল (Muswell Hill) নামক উচ্চ-ভূম পল্লীতে প্রশস্ত উদ্যান-ঘেরা একটি নাতি-প্রশস্ত বাড়ী। বাড়ীটি ভিক্টোরীয় যুগের—বেশ পাকা-পোক্ত গড়ন—সহরতলীর আজকালকার একছাঁচে ঢালা তাসের বাড়ীগুলোর মত নয়। বাড়ীটিতে থাকেন একজন অবসর-প্রাপ্ত ইংরাজ আই. সি. এস্। অশীতিপর বৃদ্ধ—গত শতাব্দীর নবম শতকে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে এখনো পর্যন্ত পেন্‌সন ভোগ ক'রছেন। তাঁর কর্মজীবনের সমস্তটাই কেটেছিল পাঞ্জাবে। সেখানে তিনি ছিলেন জেলা জজ এবং পেন্সন নেবার কিছু আগে মাস কতকের জন্য লাহোর চীফ কোর্টের বিচারাসন অলংকৃত করেছিলেন শুনেছি। তাঁর ছাত্রজীবন কেটেছিল অক্সফোর্ডের ক্রাইস্‌ট্ চার্চ কলেজে এবং চাকরী-পূর্ব জীবনটা গ্ল্যাডস্টোন-ব্রাইটের উদার মতবাদের আওতায়। সে সময় তিনি যে দীক্ষা পেয়েছিলেন, তা' এ বয়সেও ভুলতে পারেন নি। তাঁর মতো আর একজন—যাকে বলে Gladstonian Liberal—সারা ইংল্যাণ্ডে এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত। রাজনীতিক মতবাদের জন্যই বোধ হয় কর্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেন নি। তাঁর কর্মজীবনের প্রথম অবস্থায়—যাকে এখন সিভিলিয়ানি স্টীল্ ফ্রেম্ নামে অভিহিত করা হয়—তারই ছাঁচ তৈরী হচ্ছিল Strachey ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিপত্তির কারখানায়। সে যুগের ভারতীয় শাসন যন্ত্র পরিচালনে এই ভ্রাতৃ-যুগলের ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে কতটা ছিল, তা' নিশ্চয় একদিন সরকারী

দপ্তরখানার অন্ধকারা থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলংকৃত বা কলঙ্কিত ক'রবে, অতএব সে বিষয়ের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে সেকালের ভারতীয়, তথা অ্যাংলো-ভারতীয়, জীবনের গল্প যা' এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল তারই একটা আজ পত্রস্থ ক'রছি।

যদিও তিনি এখন নামানামের অতীত, তবুও এখানে তাঁর পূরো নামটা উল্লেখ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। তাঁকে Mr. C. নামেই অভিহিত করা যাক। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার মধ্যস্থতায়। এই মহিলাটি অবিবাহিতা, বয়সে প্রৌঢ়া, অশেষ গুণসমন্বিতা এবং বিশেষ ক'রে ভারত-হিতৈষিণী। এঁর একটু বিশদ পরিচয় এখানে দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এ দেশের প্রথামত বয়স্ক সন্তান হিসাবে এঁর আলাদা গৃহস্থালী আছে। ইনি আগে থাকতেন হ্যামস্টেডের একটা পুরাতন বনিয়াদি পাড়ায়। যে বাড়ীটাতে থাকতেন, সেটা এক সময়ে শিল্পী কন্‌স্টেবলের (Constable) বাসভবন ছিল—সে কথা দেয়ালে উৎকীর্ণ আছে। এ পাড়ার অধিবাসীরা নাকি বাইরের লোকের অর্থাৎ ভাড়াটিয়াদের এখানে থাকা পছন্দ করেন না—সে জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, Miss C. হ্যাম্‌স্টেডের অন্য একটা আধুনিক পাড়ায় বাসস্থান বদলি করেন। এই নূতন গৃহস্থালীতে তাঁর পোষ্য এবং আশ্রিতের সংখ্যা বড় কম ছিল না। সেথায় ছিলেন তিনটি ভারতীয় ছাত্র, দুটি অপদার্থ ইংরাজ এবং ততোধিক অপদার্থ একটি ইংরাজী-ভাষী ফরাসী যুবক যার মানসিক গঠন ছিল ঠিক আমাদের দেশের ফিরিঙ্গিদের মত। আর ছিল একটি কাকাতুয়া—Miss C-রই সমবয়সী। Miss C-র বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিল ওই ফরাসী যুবকটি। তার নামটা ছিল আভিজাত্যজ্ঞাপক, কিন্তু অবস্থা এবং শিক্ষাদীক্ষায় তেমন কিছুরই পরিচয়

পাওয়া যেত না। তাদেরি দেশে যাকে বলে plus royaliste que le roi—সে ছিল তাই। তার মতো ইংরাজভক্ত ইংরাজদের মধ্যেও দেখা যায় না আর এমন স্বজাতি-বিদ্বেষী কোনও দেশে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মাতৃভাষা প্রাণ গেলেও কইতো না। তার জীবন-স্বপ্ন—যেন তাকে লোকে ইংরাজ ব'লে মনে করে যদিও উচারণ ভঙ্গী এবং ভাষা প্রয়োগে তার ফরাসীত্ব প্রতি পদে ধরা প'ড়ে যেত। বন্ধুরা এই গৃহস্থালীকে Miss C-র menagerie বা চিড়িয়াখানা নামে অভিহিত করতেন। তিনি এতগুলি জীবের কারুর থাকার, কারুর খাওয়ার, কারুর পড়ার, কারুর বা সমস্ত খরচই বহন করতেন। বিশেষত ভারতীয়দের উপর তাঁর যেন একটা সংস্কারগত টান ছিল। তিনি জন্মেছিলেন জালন্ধরে, সেই সূত্রে নিজেকে ভারতীয় ব'লে পরিচয় দিতেন। তাঁর দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফেরেন। সেই থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্কই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তিনি তা' হ'তে দেননি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভারতীয় ছাত্রকে তিনি একদিন সমূহ বিপদ থেকে বাঁচান। আর একজনকে তিনি এক সময় রোগ এবং ঋণ উভয়ের হাত থেকে মুক্ত করেন। আর একটি ভারতীয় ছাত্রের কথায় আমায় একদিন বললেন—"ও যে সিভিল সার্ভিস পাশ ক'রতে পারেনি, তাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। কেন জানো? কেম্ব্রিজের সেই পেত্নীটা এইবার ওকে ছাড়বে।" দেখলুম, হ'লও তাই।

যাই হোক, এ হেন Miss C-র আমন্ত্রণে এবং তাঁর মাতার নিমন্ত্রণে একদিন গেলুম তাঁর পিতার সঙ্গে আলাপ ক'রতে। আমি দেশে ফেরবার আগেই Mr. C-র জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর সংগে মাত্র আমার তিনটি দিন দেখা হয়েছিল। তার বেশি যে হয়নি সে দুঃখ চিরকাল থেকে যাবে—এমন সুন্দর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।

প্রথম দিনের কথা বলছি। অভিবাদনের পর তাঁর প্রথম প্রশ্ন—How's India? উত্তরে বললুম, যে ইণ্ডিয়াকে তিনি জানতেন, তার নাড়ী এখন বিশেষ চঞ্চল। তাঁকে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে হ'ল, কেননা তাঁর প্রিয় পঞ্চনদের একটা বিশেষ দুর্ঘটনার দিন থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সংবাদ তাঁকে বড় একটা রাখতে দেওয়া হয়নি—তাঁর ডাক্তার এবং তাঁর স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে। আমার কথা তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বটে, তবে সে বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশ না ক'রেই নিজের যেন একটা পূর্বেকার চিন্তাসূত্রের জের টেনে বললেন—একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ? আইরিশ আর ভারতীয়দের একটা বিষয়ে খুব মিল আছে। এই দু'জাতই নিজেদের অত্যাচারিত মনে করে, অথচ এরাই আবার ব্রিটিশ নামের দোহাই দিয়ে বিদেশে নেটিভদের উপর এমন অত্যাচার করে যা' একদিক দিয়ে দেখতে গেলে যেমন হাস্যকর অন্যদিকে তেমনি কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ব'লে মনে হয়। ব্রিটিশ-চর্মাবৃত আইরিশের সঙ্গে তো পাঞ্জাবীদের এবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, অথচ এই পাঞ্জাবী শিখেরাই আবার হংকং-সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ-চর্মাবৃত পাহারাওয়ালারূপে চীনাদের উপর কি অত্যাচারটাই না করে। অথচ তারা এটা বোঝে না যে, কলঙ্কটার সমস্ত ভার ব্রিটিশদের উপরেই পড়ে না, বেশির ভাগটা পড়ে তাদের স্বজাতির উপরেই। প্রবাদ কথা যা' আছে, তা' ঠিক-ই— বান্দা আর জবর্দস্ত এক ধাতুতেই গড়া।

বললুম,—আশ্চর্য, আইরিশদের সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েও তো আপনি আগাগোড়াই হোমরুলের পক্ষপাতী ছিলেন।

জানা ছিল, Asquith মহোদয় তাঁর হোমরুল বিল পাশ করার ব্যাপারে যখন লর্ড সভা থেকে বাধা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিজের দলের যে ৪০০ জন লোককে পীয়রত্বে উন্নীত ক'রে, সেখানকার ভোট

সংখ্যা নিজের আয়ত্তে আনবার উদ্যোগ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে Mr.C ছিলেন একজন। এটা শুনেছিলুম Manchester Guardian সংশ্লিষ্ট একজন বিশিষ্ট সাংবাদিকের মুখে। তিনি আরও বলেছিলেন, Asquith বেছে নিয়েছিলেন এমন সব লোক যাঁদের পুত্রসন্তান ছিল না, অর্থাৎ উপাধিগুলোর জের যেন এক পুরুষের বেশি না টানে।

আমার প্রশ্ন শুনে Mr. C. হাসলেন, প্রতিপ্রশ্ন করলেন—একমাত্র এই কারণটাই কি আয়র্ল্যাণ্ডে এবং ভারতে হোমরুল প্রবর্তন করবার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তিপ্রদ নয়?

সেদিন আরও অনেক কথা হ'ল, কিন্তু সেগুলোর উল্লেখ করা অবান্তর হবে। বিদায় নিয়ে ফেরবার সময়ে তিনি তাঁর লাইব্রেরীতে রক্ষিত গোখ্‌লের একখণ্ড বক্তৃতা সংগ্রহ দেখালেন—তার পাতাগুলোর মার্জিন Mr. C-র স্বহস্ত লিখিত নোটে ভরা। তাঁর কথায় বুঝলুম, তিনি একসময় গোখ্‌লের খুব অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের শেষ অবস্থায়—সেটা গোখ্‌লের জীবনেরও শেষ অবস্থা—যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, তখন এ বাড়ীতে কয়েকবার তাঁর শুভ পদার্পণ হয়েছে, সে কথাও বললেন।

* * * *

মাসখানেক বাইরে কাটবার পর লণ্ডনে ফিরে C-পরিবারের ডিনারের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলুম। Mr. C-র সঙ্গে এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। সেদিনই তাঁর সঙ্গে বেশি কথা হয়েছিল। Mrs. C বয়সের দরুণ কাণে শোনেন কম, তাই তিনি আমাদের কথাবার্তায় বিশেষ যোগ দিতে পারেননি। শুনলুম, এই বধিরতার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় একটা বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং বাকী অবসরটা— যদি বৃষ্টি বাদল না হয়—তিনি কাটান্ সাউথ কেনসিংটন ম্যুসিয়মে কতকগুলো মনোমত ছবি নকল ক'রে।

Mr. C-র বাড়ীটাই যে শুধু ভিক্টোরীয় যুগের ছিল, তা' নয়। ভিতরের আসবাব পত্রও ছিল তাই—যতটা বাহুল্যে ভরা ততটা স্বস্তিপ্রদ নয়। আমার আহেল-বিলাতি চোখে নানারূপ টুকিটাকি শোভিত ম্যাণ্ট্‌লপিস, দেয়ালে টেবিলে ফটোগ্রাফের প্রাচুর্য, আরাম কেদারার শিরোদেশে অ্যান্টিম্যাকাসার প্রভৃতি একটু বিসদৃশ ব'লে ঠেকছিল। ডিনারেও প্রাচুর্য ছিল প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি। উপরন্তু, ভারতীয় অতিথির সম্মানার্থ পোলাও এবং কোর্মার আয়োজন ছিল। বলা বাহুল্য, এ দুটি ভোজ্য আসল জিনিসের কাছেও পৌঁছয়নি। তবে এটা মানতে হবে যে, বাঙালী হিন্দু বাড়ীর উৎসবাদিতে যা' পোলাও এবং কোর্মা নামে পরিবেশিত হয়, তার চেয়ে এগুলো কোন অংশে খারাপ ছিল না।

শুনলুম, তাঁদের বৃদ্ধা পাচিকা বহু বৎসর আগে Veeraswamy নামধেয় ভোজনশালার এক পাচকের কাছ থেকে এগুলো শিখেছিলেন এবং ইদানীন্তন এঁদের অনুৎসাহে শিক্ষাটা প্রায় ভুলতে বসেছেন। এই সূত্রে আরও শুনলুম যে, লণ্ডনে সব রকম ভারতীয় মশলাই কিনতে পাওয়া যায়—পিক্যাডিলি অঞ্চলে Belati Bungalow ব'লে একটা দোকান আছে, সেইখানে। সেদিন এটাও জেনে নিলুম যে, Veeraswamy ছাড়া আরও দু' একটা ভাল দেশী ভোজনালয় লণ্ডনে আছে, যাতে এমন কি বিরিয়ানি জাতীয় পোলাওর দর্শনও সুদুর্লভ নয়। গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—ভারতীয় ছাত্রেরা বোধ হয় সেখানে খুব যায়?

তাঁর কন্যার ভারতীয় ছাত্রজীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার চেয়ে বেশি। তিনি বললেন—উহুঁ, তারা যায় Gower Street-এ সেই যেখানে Y. M. C. A.-দের ভোজনশালা আছে Indian Students Union-এর সম্পর্কে, সেইখানে। সেখানে খুব সস্তা।

কিন্তু কী নোংরা! ব্রমটন্ অঞ্চলে ওদের আর একটা আড্ডা আছে —তাকে ওরা Isca বলে—সেটা বরং কিছু ভাল।

আমার এগুলোর কোনটার সঙ্গেই তখন পর্যন্ত পরিচয় হয়নি, অতএব চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

সেদিন ডিনারের সঙ্গে পানীয় আয়োজনের মধ্যে লক্ষ্য করলুম এক অপরিচিত আসব—টোকাই (Tokay)—যার ব্যবহার ইংল্যাণ্ডে খুব প্রচলন নেই। Mr. C বললেন, বৃদ্ধদের উপর ওটার শক্তিপ্রদ প্রভাব অদ্ভুত। Mr. C-র বার্ধক্য সত্ত্বেও সেদিনকার স্ফূর্তিভাব দেখে সেটা মেনে নিতে হ'ল। আমাকে সেদিন বেশি কথা কইতে হয়নি; তিনি নিজের আনন্দেই সেকালের অনেক কথা বললেন। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের স্মৃতি-প্রদীপ নিভে যাবার আগে সেইদিনই বোধ হয় শেষ জ্বলে উঠেছিল। সেটা ওই Tokay-এর প্রভাবে কি তাঁর প্রিয় পঞ্চনদের সঙ্গে পরিচিত এক ভারতীয়ের সংস্পর্শনে, তা' বলা শক্ত। বোধ হয়, দুটোর সংমিশ্রনেই।

Mr. C বললেন—আমাদের সময়টা ছিল গৌরব করবার মতো। অ্যাংলো-ভারতে তখন প্রতিভার অভাব ছিল না। আমাদের সার্ভিসেই তো ছিলেন Alfred Lyall, কবি ও সমালোচক হিসাবে লণ্ডনের সাহিত্য জগতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সার্ভিসে থাকতেই। তোমরা তাঁর কবিতা আর English Men of Letters সিরীজের Tennyson-খানা তো পড়েছ। কিন্তু তখনকার দিনে Pioneerএ তাঁর অনেক ভাল দরের লেখা বেরিয়েছে —সেগুলো হয়ত তোমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। তিনি লিখতেন বাপুদেব শাস্ত্রী ছদ্মনামে। Edwin Arnold শিক্ষাবিভাগে ছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের সময়কার লোক। Kipling এঁদের পরে।......Rudyard-তো ছেলে মানুষ। তার প্রথম উচ্ছ্বাস

আমার এখনো মনে আছে। সিভিল-মিলিটারিতে (Civil and Military Gazette) তার গল্পগুলো মন্দ লাগত না—ওর বয়সের অনুপাতে একটু ডেঁপোমি ব'লে মনে হ'ত যদিও। ওর প্রথম বইখানা কিনি আম্বালা স্টেশনে হুইলারের বুকস্টল থেকে—বেশ মনে আছে, ব্রাউন-পেপারে মোড়া, এক টাকা দাম।......জানি হে জানি, সে বইখানা আজ থাকলে Sotheby-র নিলামে অনেক টাকায় বিক্রী হ'ত।......ওর পিতা Lockwood Kipling-কে খুব ভাল ক'রেই জানতুম। লোকটা সত্যিকারের আর্টিস্ট ছিল হে! অর্থ-স্পৃহা মোটেই ছিল না। ম্যুসিয়মের Curator হিসাবে আর কত মাহিয়ানাই বা পেত, কিন্তু ওই কাজেই সে জীবন উৎসর্গ করেছিল। Rudyard-কে বিলাতে বছর চার-পাঁচের বেশি পড়াতে পারেনি। তার ষোল-সতেরো বছর বয়সেই লেখাপড়া ছাড়িয়ে সিভিল-মিলিটারি গেজেটে একটা সাব-এডিটারি জোগাড় ক'রে তাকে নিজের কাছেই এনে রেখেছিল। ভারতীয় কারুশিল্পের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় ওই Lockwood-ই। লোকটা উঁচুদরের সমঝদার ছিল। Mantelpiece-এর দুধারে ওই যে দুটো কাঠের জালি-কাজ-করা ঝরোকা দেখছ—ও দুটো আমাকে সে-ই বেছে কিনিয়ে দেয়—খুব পুরাতন হাতের কাজ। আমার স্ত্রীর অঙ্কন বিদ্যার গুরুও ছিল সে। আঁকতে এবং মডেলিং করতে তখন পাঞ্জাবে ওর জোড়া কেউ ছিল না। তার ক্ষমতা ফুটে উঠত atmosphere সৃষ্টি করায়। সেইটেই ছিল ওর আর্টের বিশেষত্ব। রাডিয়ার্ডের লেখাতে—বিশেষ ক'রে তার Kim বইখানাতে অনুরূপ ক্ষমতার যে পরিচয় পাও, সেটা জেনো তার পিতার কাছ থেকেই পাওয়া।

—কিন্তু ওঁর লেখাতে বাঙালী বিদ্বেষের ভাবটা লক্ষ্য করেছেন? উনি কখনো কোন বাঙালীর সংশ্রবে এসেছিলেন ব'লে তো জানি না।

—শুধুই কি বাঙালী বিদ্বেষ? ও আমাদেরও ছেড়ে কথা কয়নি। অতিরঞ্জনই বোধ হয় ওর লেখার প্রাণ। অন্তত আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, আমাদের সময়কার সিমলায় কিপ্‌লিং-চিত্রিত Mrs. Hawksbee-র অস্তিত্ব ছিল না একেবারেই। তখনকার সিমলা সমাজের প্রবেশবন্ধনী ছিল খুব শক্ত। এক অখ্যাতনামা সাংবাদিকের পক্ষে—তা' সে ইংরাজ হ'লেও—সে বন্ধন খোলা সহজ ছিল না। ওর আমাদের উপর ঝাল ঝাড়াটা ওই রুদ্ধ কবাটের উপর বৃথা মুষ্ট্যাঘাত ছাড়া কিছুই নয়।... ...

আর বাঙালী বিদ্বেষের কথা যে ব'ললে, তার সাধারণ কারণ এই হ'তে পারে যে, ঠিক ওই সময়টাতেই ভারতীয়েরা প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টা সুরু করেছিল—বাঙালীর নেতৃত্বে। কংগ্রেসে, সিভিল সার্ভিসে, বার্‌-এ, সংবাদপত্রে—সবক্ষেত্রেই বাঙালীরা ভারতের অন্যান্য জাতকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছিল। সেটা আমাদের অনেকের মতো কিপ্‌লিং-এর জিঙ্গো চোখেও ভাল ঠেকেনি।...তবে ও যে বাঙালীর সংশ্রবে এসেছিল—মুখ্যভাবে না হলেও গৌণভাবে—তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। তবে সেইটেই যে তার বাঙালী বিদ্বেষের কারণ, তা' অবশ্য আমি শপথ ক'রে বলতে পারব না। যাই হোক, গল্পটা শোন।

সর্দার দয়াল সিং ছিলেন—জানই তো—শিখ মজিঠিয়া বংশের বড় ঘরওয়ানা। আমাদের মুরুব্বিয়ানা বন্ধুত্ব তাঁর ভাল লাগল না—তিনি বাংলাদেশে গিয়ে কংগ্রেস ও ব্রাহ্মসমাজের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। তারপর দেশে ফিরে খুললেন Tribune পত্রিকা—কংগ্রেসের মুখপত্ররূপে। সম্পাদক ক'রে নিয়ে এলেন সুরেন বাঁড়ুয্যের এক চেলা—শীতলাকান্ত চ্যাটার্জি নামে। চ্যাটার্জি ছিল বয়সে ছোক্‌রা—বক্তৃতা দিতেও যেমন, লিখতেও তেমন, খুব তেজী—গুরুর

উপযুক্ত শিষ্য। গোড়া থেকেই ট্রিবিউনের সঙ্গে সিভিল-মিলিটারির বেধে গেল ঝগড়া। কিপ্‌লিং ছিল তখন সিভিল-মিলিটারির সহ-সম্পাদক—আর দু'জনেই ছিল যুবা। কিছুদিন যেতে না যেতে চ্যাটার্জি তার কাগজে অমৃতসর না কোন্ জেলার পুলিস-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্-এর জবরদস্তির কাহিনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। সিভিল-মিলিটারি সে সময় ছিল সরকারী কর্মচারীদের একরূপ মুখপত্রের মত। তার এটা সহ্য হ'ল না। বিতণ্ডা বেড়েই চ'লল। ব্যাপারটা ক্রমশ এমন দাঁড়ালো যে, সেই পুলিস সাহেবটিকে ট্রিবিউন-এর বিরুদ্ধে মামলা আনতে বাধ্য হতে হ'ল—নয়ত তার চাকরীতে ইস্তফা দিতে হয়। চীফ্ কোর্টের বিচারে ট্রিবিউন-এর হ'ল জয়। ফলে, সেই পুলিস সাহেবটি হ'ল বদলি আর তার পদোন্নতিও বুঝি বছরকয়েকের জন্য হ'ল বন্ধ। যতটা মনে পড়ে, এই মকদ্দমার পর পাঞ্জাব সরকার গেজেটে চ্যাটার্জিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই পুলিস সাহেবটি ছিল কিপ্‌লিং-এর বিশেষ বন্ধু—কিপ্‌লিং-সৃষ্ট Strickland Sahib-এর original ছিল সে-ই। এর পিতা এবং পিতামহ উভয়েই সীমান্ত ফৌজের সেনানী হিসাবে এক সময়ে সুপরিচিত ছিলেন এবং এর পিতামহী এবং বোধ হয় মাতাও ছিলেন একেবারে খাস্ পাঠান রমণী······

Mr. C এই ব্যক্তিটির নাম করেছিলেন, এবং তার নামের সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল। কিন্তু ইনি এখনও জীবিত আছেন ব'লে সেটা এখানে উল্লেখ করলুম না।······

Mr. C ব'লে যেতে লাগলেন—কী গুণে যে কিপলিং Nobel Prize পেলে, তা' আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলুম না। ওর লেখা যে একসময়ে ব্রিটিশ জিঙ্গো মনে আর নূতনত্ব-প্রিয় ইয়াঙ্কি মনে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবুও

মনে হয়, সেটা ওর ভাগ্যের ব্যাপার যতটা, প্রতিভার ব্যাপার ততটা নয়। অত কম বয়সে এক Byron ছাড়া আর কেউ অত নাম করতে পারেনি।······

সে সময় Pioner আর সিভিল-মিলিটারি একই স্বত্বাধিকারিত্বে পরিচালিত হ'ত। বছর কতক সিভিল-মিলিটারিতে কাজ করার পর Pioneer-এর খরচায় কিপ্‌লিং পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরোয়—যার মুখ্য ফল From Sea to Sea এবং গৌণ ফল ওর ভাগ্য পরিবর্তন। প্রথমে অ্যামেরিকা, পরে ইংল্যাণ্ড—দুই-ই ও অধিকার ক'রে ব'সল। ওকে আর পিছন ফিরে চাইতে হ'ল না, হিন্দুস্থানে ফেরবার দরকারও ফুরিয়ে গেল। তারপর বুয়র যুদ্ধের তন্ত্রধারকত্ব, নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি, এবং তারপর—

বিস্মৃতি—আমি বাধা দিয়ে বললুম। আরও বললুম, কিপ্‌লিং-এর বিষয়ে Oscar Wilde-এর যাচাই সাহিত্যিক-অসাহিত্যিক নির্বিশেষে সকলেই এখন মেনে নিয়েছে ব'লে মনে হয়।

—ঠিকই অনুমান করেছ। তবে ওর আসল যাচাইটা আরম্ভ হয় নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে। নেশা কাটবার পর লোকে বুঝলে যে, ওর প্রতিভার সঙ্গে কতটা পরিমাণে vulgarity-র খাদ মিশানো আছে।

বললুম, ওর গোড়াকার লেখাগুলোর সঙ্গে Eha-র লেখার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়, তবে Eha-র লেখার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা Kipling-এর লেখায় পাওয়া যায় না।

—আর যা' পাওয়া যায়, তা' হচ্ছে malice, Mr. C বললেন। এই খাদটা ওর প্রতিভার সঙ্গে না মিশলে ও হয়ত বা Aberigh Mackay-এর মত সকলেরই মনোরঞ্জন ক'রতে পারত।

বললুম, হ্যাঁ, এবারি মেকাই-ও বাঙালীদের নিয়ে পরিহাস করেছেন, কিন্তু তা উপভোগ ক'রতে বাঙালীদেরও কোথাও বাধে না।

—তার কারণ তার লেখার ভিতর সত্যিকারের humour ছিল এবং malice জিনিসটা তার স্বভাবে একেবারেই ছিল না।·· জান, Aberigh Mackay ছিল এক সময়ে আমাদের অ্যাংলো-ভারতীয়দের সাহিত্যিক hero? ওর কথা যখন উঠল, ওর বিষয়ে একটা গল্প বলি শোন।

রাত্রি বেশ হয়েছিল, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের পাশে ব'সে সেকালের গল্প শোনবার লোভও বড় কম ছিল না।

Mr. C ব'লে যেতে লাগলেন—তখনকার দিনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা লিখতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই একটা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন, সেইটেই ছিল ফ্যাশান। Eha-র আসল নাম ছিল E. H. Aitken—কাজ করতেন বোম্বাই-এর কাস্টমস্ বিভাগে। নামের তিনটে আদ্যক্ষর নিয়ে তাঁর ছদ্মনাম হয়েছিল Eha। বড়লাট লিটন্ Owen Meredith নাম নিয়ে কবি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা তো জানই। আর Alfred Lyall-এর কথাতো আগেই বলেছি। Aberigh Mackay-এর ছদ্মনাম ছিল Sir Ali Baba।··· গল্পটা লর্ড লিটনের সময়কার। তখন লণ্ডনে Vanity Fair নামে সাপ্তাহিক কাগজটার খুব প্রতিপত্তি ছিল। একদিন দেখা গেল, Sir Ali Baba নামধেয় কে-একজনের লেখা ভারতীয় চিত্রকথা তাতে বেরিয়েছে। কী তার লিখন ভঙ্গী! সপ্তাহের পর সপ্তাহ এ-রকম বেরোতে লাগল। বিলাতের অধিকাংশ কাগজে সেগুলো উদ্ধৃত হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমালোচকরা একবাক্যে মত দিলেন, Thackeray-র পর এ রকম খাঁটি humour কারুর লেখনী থেকে আজ অবধি বেরোয়নি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোট কথা, একটা

ভীষণ সাড়া প'ড়ে গেল এবং সে সাড়ার ঢেউ অ্যাংলো-ভারতের উপকূলে এসে পৌঁছতেও দেরি লাগেনি। অথচ কে যে এই Sir Ali Baba তার কিছুই নিষ্পত্তি হ'ল না। এটা বোঝা গেল, লেখক যিনিই হোন, তিনি ভারতীয় তথা অ্যাংলো-ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। অনেকে অনেক রকম অনুমান করলেন। আমাদের ক্ষুদ্র জগতটিতে গোপনীয় ব'লে কিছু ছিল না। সকলেই সকলকার গুহ্যতম কথা অবধি জানতুম, আর সেইটেই ছিল আমাদের গর্ব। কাজেই দেড বৎসর ধ'রে Sir Ali Baba-র রহস্য ভেদ না ক'রতে পেরে আমরা যে নিষ্ফল আক্রোশে মরিয়া হ'য়ে উঠব, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।...তারপর হঠাৎ একদিন জানা গেল Sir Ali Baba আর কেহই নন—রাজওয়াড়ার কুমারদের জন্য আজমীরে যে Mayo College আছে তারই প্রিন্সিপ্যাল Aberigh Mackay। কি ক'রে যে রহস্য ফাঁস হ'ল, সেই গল্পই বলছি।

Aberigh Mackay ছিলেন অসম্ভব রকমের লাজুক প্রকৃতির লোক। কারুর সঙ্গেই মিশতেন না, নিজেকে একেবারে নিজের ভিতরেই লুকিয়ে রাখতেন। কাজেই কেউই কখনো সন্দেহ করেনি যে, ওঁর ভিতর অতটা রসসৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে পারে।...আমি তখন ছুটিতে সিমলায়। লাট বাড়িতে একদিন বিরাট ভোজের আয়োজন, নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে গেছি। ডিনার টেবিলে দেখলুম, লাট সাহেবের পাশে সম্মানের আসনে ব'সে আছেন এক ভদ্রলোক অতি সঙ্কুচিতভাবে। তাঁকে এর আগে কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ল না। কানাঘুষায় শুনলুম, তিনি মেয়ো কলেজের প্রিন্সিপাল, নাম Aberigh Mackay। আশ্চর্য হবার কথা, কেননা সিমলার সার্ভিস সম্প্রদায় বরাবরই একটু অতিরিক্ত পরিমাণে snobbish।

তবে সেটা অবশ্য সরকারী ব্যাপার ছিল না, লাটপত্নীও অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত ছিলেন, এটিকেট্ ছিল শিথিল এবং লর্ড লিটনের খামখেয়ালি ছিল সর্বজনবিদিত। তাই এক কলেজের প্রিন্সিপ্যালের এই সম্মানে যতটা বিরক্তি সৃষ্টি হবার কথা, ততটা হয়নি। Sir Ali Baba-র লেখা সমাজে কতটা চাঞ্চল্য সৃজন করেছিল তা' এই থেকেই বোঝা যাবে যে, ডিনার টেবিলে সেই অজ্ঞাত লোকটিই ছিলেন প্রধান আলোচনার বিষয়। দু' একজন privileged মহিলা এরূপ ইঙ্গিতও করলেন যে, Sir Ali Baba হয়ত কবি Owen Meredith-এরই গদ্য-রূপক নাম। লর্ড লিটন ইঙ্গিতটা সরব হাস্যে বেমালুম এড়িয়ে গেলেন।...কথার ফাঁকে লক্ষ্য করলুম, Aberigh Mackay নুনের পাত্রটার দিকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে হাত বাড়িয়ে আবার হঠাৎ সেটা গুটিয়ে নিলেন। এতটাই লজ্জা সঙ্কোচ ছিল তাঁর। পাত্রটা ছিল লাট সাহেবের প্লেটের কাছে। লর্ড লিটনের আর একপাশে ছিলেন Madame Henri—এক ভারত-পর্যটনকারী ফরাসী মিনিস্টারের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গেই তখন তিনি কথায় ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁর লাজুক অতিথির লবণ-আহরণের চেষ্টা লক্ষ্য করেন নি; কিন্তু সেটা মাদাম্ আঁরি-র চক্ষু এড়ায়নি। তিনি লবণদানিটা সরিয়ে দিতে লর্ড লিটনকে অনুরোধ করলেন। লর্ড লিটন যেন সদ্য ঘুম ভেঙে চকিতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—Who shall I pass it to? তারপর Aberigh Mackay-এর দিকে সস্মিতমুখে ফিরে—To Sir Ali Baba? সকলেরই চকিত দৃষ্টি তখন Aberigh Mackay-এর উপর পড়েছে। লর্ড লিটনের ইচ্ছাও ছিল তাই, সেইজন্যেই কথাগুলো বলতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বর ব্যবহার করেছিলেন। বেচারা আলিবাবা ততক্ষণ লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে—তোৎলামি ক'রেও If you please, Sir ব'লতে

একেবারে ঘেমে মৃতপ্রায় হয়ে উঠল।...ব্যাপারটা ছিল আগাগোড়াই লর্ড লিটনের stage management। ও বিষয়ে তিনি একেবারে ওস্তাদ ছিলেন।...শ্যাম্পেনের স্রোতে সেদিনকার ডিনার শেষ হ'ল। সকলের স্বাস্থ্যপানের জবাবে এক এক চুমুক পান ক'রেও আলিবাবার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। তারপর তাকে রিকৃশাতে চড়িয়ে For he's a jolly good fellow-র তাণ্ডব সুরে লাট ভবনের কম্পাউণ্ড প্রদক্ষিণ হ'ল। এ সব বিষয়ে লর্ড লিটন খুব বেপরোয়া ছিলেন, তাই রক্ষা। আর এ ব্যাপারের সাক্ষী দেশী লোক কেউ ছিল না, চাকররা ছাড়া। নেশার ঘোরেও আমাদের প্রেস্টিজ জ্ঞানের কম্‌তি হয়নি।...

কোথায় ছিল তখন কিপ্‌লিং? এবারি মেকাই-এর শেষ হয়ে গেল Twenty-One Days in India লিখেই। স্বাস্থ্য তার বরাবরই খারাপ ছিল। অত কম বয়সে না মারা গেলে, আজ কোথায় থাকত কিপ্‌লিং আর কোথায় থাকত তার মক্স-করা কালি-লেপিত ভারতীয় জীবনের চিত্র!...

* * *

শীতের প্রারম্ভেই Mr. C-র শরীর ভেঙে পড়বার লক্ষণ দেখা গেল। একটু ভাল থাকার খবর পেয়ে দেখা করতে গেলুম। গিয়ে শুনলুম সেই দিনই অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হ'য়ে পড়েছে। এখন তাঁর জ্ঞান নেই এবং জীবনের আশাও নেই।

মৃত্যুর কিছু পূর্বে বেহুঁস অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো বহুদিন-বিস্মৃত উর্দু কবিতার একটা টুক্‌রো—শাম্-আ রওশন্ কর্‌ও—প্রদীপ জ্বালো।

—কথিকা—

দেবদাসী

মন্দিরের দেবদাসী—দেবতার চিত্ত বিনোদন করাই ছিল তার কাজ।

প্রত্যূষে দেবতার নিদ্রা ভাঙ্গত—তারই নূপুর শিঞ্জনে; মধ্যাহ্নে দেবতার ভোগ-নিবেদন সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ত—তারই দেহযষ্টির ললিত কম্পনে; তারই লীলায়িত হস্তের গন্ধমাল্যে দেবতার প্রসাধন সমাপন হ'ত; মধ্যরাত্রে তারই কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন দেবতার কাছে সুপ্তিরাজ্যের বার্তা ব'হে এনে দিত।

আরতির সময় সে দেখ্‌ত—দেবতা শুধু তারই দিকে চেয়ে রয়েছেন; তাঁর বদন প্রসন্নহাস্যে উজ্জ্বল।

ক্রটী-অক্রটীর কথা তার মনেই উঠ্‌ত না; দেবতার কাজে কি কখনো ক্রটী হওয়া সম্ভব?

*　　　　*　　　　*

সে যে কোথা থেকে এসেছিল—তা' নিজেও জানত না। কোন্ গোপন প্রেমের গভীর আকর্ষণ তাকে স্বর্গচ্যুত ক'রেছিল; মর্ত্য-সমাজের কোন্ ভয়-সঞ্জাত ঘৃণা অসহায় শিশুকে মন্দির সোপানে ফেলে রেখে গিছল—তা' জানতেন এক অন্তর্যামী আর বোধ হয় মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী।

কৈশোরের অর্জিত ললিত কলা যৌবনের প্রারম্ভে সে দেবতারই চরণে উৎসর্গ ক'রেছিল।

কণ্ঠে মাখানো ছিল বিশ্ব-মথিত সুধা ; দেহে জড়ানো ছিল অমরার লাবণ্য ; সুপ্ত প্রেমের ইঙ্গিত ছিল তার ললিত বাহুর ভঙ্গিমায় ; স্বজনের তাল বেজে উঠ্‌ত তার চরণ নূপুরে।

তার বুকের মাঝে লুকানো ছিল যে অনাবিল পবিত্রতা—অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধটুকুর মতো—যে কথা জানতেন শুধু অন্তর্যামী।

আর তার রূপের সাথে মিশানো ছিল যে তীব্র মাদকতা—আঙ্গুর-চোয়ানো রসের মত—সে কথা জান্‌ত শুধু মন্দিরের বৃদ্ধ পূজারী।

* * *

সেদিন রাসোৎসবের সঙ্গীত লীলায় নর্তকী ছিল বিভোর। কোন্ এক অতীত যুগের মিলন-ক্ষণটি স্মৃতির দুয়ার খুলে আজ বেরিয়ে এসেছিল।...

সে দেখ্‌ছিল—চন্দ্র-করোজ্জ্বল রাত্রি, নূপুর-মুখর যমুনার বেলাভূমি, গোপীনেত্রের তৃপ্তি-বিভোল চাহনি, দেবতার দীপ্ত প্রসন্ন মুখ। সেদিন বিশ্বে কোথাও অতৃপ্তি ছিল না ; অতৃপ্তি-জনিত আকাঙ্ক্ষা ছিল না। শুধু ছিল একটা বিরাট মিলনের শান্ত মধুরিমা ; সৃষ্টির একটা বিশ্রাম মুহূর্ত—পূর্ণ, স্থির, অক্ষুব্ধ।...

পূজারীর কণ্ঠস্বরে তার স্বপ্ন টুটে গেল ; শুন্‌লে—"বৎস, এরূপ-ভাবে তো আর চলে না।"

নর্তকী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; প্রশ্ন ক'রলে—"প্রভু, কোনও অপরাধ হ'য়েছে কি ?"

—"অপরাধ নয়, ত্রুটী। সমস্ত মন দিয়ে তুমি দেবতার তৃপ্তি-সাধন ক'রছ, সত্য। কিন্তু দেবতার চরণেতো শুধু ভক্তি অর্ঘ্য দিলেই সর্বস্ব দেওয়া হয় না।"

—"আরও কি দিতে হবে বলুন।"

—"দেবতাকে পূজা ক'রতে হয়—তনু, মন, ধন দিয়ে। তুমি শুধু একটি দিয়েছ, তাতে তো দেবতার তৃপ্তি সম্ভব নয়; সে পূজা যে অসম্পূর্ণ।...তোমার বিত্ত নাই, কিন্তু রূপ আছে। তুমি তনু উৎসর্গ ক'রে ধন উপার্জন ক'রতে পার—দেবতার অভাব পূরণের জন্য।"

নর্তকীর কুমারী হৃদয়ে পূজারীর ঈঙ্গিতে প্রথমটা কোন সাড়াই প'ড়ল না। যখন সে বুঝলে, তখন তার দেহ-মন একেবারে অসাড় হ'য়ে গেল। ব'ললে—"প্রভু, অন্তরের দেবতা যাতে ক্ষুণ্ণ হন, বাহিরের দেবতা কি তাতে তুষ্ট হবেন?"

পূজারী অসঙ্কোচে উত্তর ক'রলে—"অন্তরের দেবতা মিথ্যা। তার বাণীও মিথ্যা। বাহিরের দেবতাই সত্য, জাগ্রত, স্বপ্রকাশ।"

তারপর একটু থেমে তীব্রস্বরে ব'ললে—"পাপিষ্ঠা, এইটুকু বুঝলি না, দেবতা তোকে রূপ দিয়েছেন তাঁরই সেবার জন্য। সত্যইতো তাঁর কোন অভাব নাই—এ শুধু তোর একটা পরীক্ষা; তোরই মুক্তির সোপান।"

রুদ্ধকণ্ঠে দেবদাসী ব'ললে—"প্রভু, শুধু একটা রাত্রি সময় দিন।"

*　　　*　　　*

গভীর রাত্রে মন্দিরাভ্যন্তরে নর্তকীর রুদ্ধ আবেগ হৃদয়-কবাট খুলে দেবতার চরণে গিয়ে প'ড়ল।...ওগো অন্তর্যামী, হে আমার জাগ্রত দেবতা, ওগো আমার ধ্যানসর্বস্ব, আমায় বলো—নারীধর্ম বিসর্জন না দিলে কি আমার সেবাধর্ম অপূর্ণ র'য়ে যাবে? তোমার তুষ্টিসাধন হবে না? ইহাই কি তোমার অভিপ্রেত? ইহাই কি আমার মোক্ষপথের সোপান?...

পাষাণ দেবতা নির্বাক, নিশ্চল—সেবিকার প্রশ্নের কোন উত্তরই এল না।

*　　　*　　　*

রাত্রি শেষে দেবদাসী মন্দির থেকে বেরিয়ে এল; দেখলে সামনে দাঁড়িয়ে পূজারী। ক্লান্তস্বরে ব'ললে—"প্রভু, দেবতার তো কোনও আদেশ হ'ল না।"

পূজারী স্মিতহাস্যে ব'ললে—"ওরে অবুঝ, দেবতা কি কথা কন্? তাঁর আদেশ বাক্য হ'য়ে ফোটে আমারি কণ্ঠে—মর্ত্যে আমিই যে তাঁর প্রতিভূ।"

যন্ত্রচালিত কণ্ঠে সেবিকা সম্মতি দিলে—"তবে তাই হোক্।"

*　　　*　　　*

সৃষ্টি-প্রকরণ ঠিক পূর্বের মতই চ'লছে; জগতের কোথাও কিছু পরিবর্তন হয় নাই। শুধু—নর্তকীর কনক নূপুরে মাঝে মাঝে তাল ভঙ্গ হ'য়ে যায়।

মাত্র এইটুকু।

নারী

পুরুষ ব'ললে—"নারী, তুমি আমার দাসী, আমার সম্পত্তি,।" নারী মাথা নত ক'রে ব'ললে—"আমি তাই।"

দেবতা অলক্ষ্য থেকে একটু হাসলেন মাত্র।

*   *   *

দিনের পর দিন যায়। পুরুষের পরিশ্রমেরও অন্ত নাই; নারীর বিশ্রামেরও অবসর নাই। পুরুষ চায়, নারী জোগায়। নারী খাওয়ায়; পুরুষ খায়। পুরুষ বাইরের টানে ঘর ছেড়ে যায়; নারী পুরুষের টানে ঘরেই প'ড়ে থাকে। পুরুষ বাইরে বাস্তবের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফ্যালে; নারী ঘরে কল্পনার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়। পুরুষ ঘরে ফেরে বিশ্রাম ক'রতে; নারী ঘর্-বার্ করে সেই বিশ্রামটুকুর আয়োজন ক'রতে। পুরুষ হুকুম করে—কেননা সে প্রভু; নারী শোনে—কেননা সে দাসী।

এমনি ক'রেই দিন গুলো কাটছিল। কেটেও যেত, যদি অলক্ষ্য থেকে দেবতা না বাদ সাধতেন।

*   *   *

পুরুষের অর্জিত বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের মধ্যে একটা অনির্দেশ্য চাঞ্চল্যের অনুভূতি এল। নারীর কাজ ক'মে গেল।

পুরুষ বাইরে চেয়ে দেখলে—তারই জন্যে সাজানো র'য়েছে প্রভাতের স্বর্ণ-উজল অরুণিমা, মধ্যাহ্নের ছায়া-শীতল নীরবতা, গোধূলির মৌন-রঙিন মাধুর্য, রাত্রির নির্জন অবসর।

ভিতরের দিকে দেখলে—সে সবতো কিছুই নাই; আছে কেবল একটা বিরাট শূন্যতা, একটা নূতন-জাগা আকাঙ্ক্ষা, একটা অচেনা অনুভূতির উদ্বেগ।

এ শূন্যতা কে পূর্ণ ক'রবে? এ আকাঙ্ক্ষা কে মেটাবে? এ উদ্বেগ কে শান্ত ক'রবে? বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে সার্থক ক'রে তুলবে—সে কে? আকাঙ্ক্ষাকে রূপের মাঝে, সৌন্দর্য্যকে ভোগের মাঝে ফুটিয়ে তুলবে—সে কে?

পুরুষ মুখ তুলে চাইলে—সামনে দাঁড়িয়ে নারী।

পুরুষের আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত চোখের সামনে নারীর দৃষ্টি নত হ'য়ে এল।

পুরুষ সেদিন বুঝ্‌লে—ভিতরের অভাবটা পুরিয়ে দিতে পারে একমাত্র এই নারী। বিশ্বপ্রকৃতির ভাবঘন মূর্তি এই নারী—প্রভাত অরুণের আভা র'য়েছে এর গণ্ডে; মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি র'য়েছে এর কটাক্ষে; সন্ধ্যার ম্লান সুরটি বেজে উঠ্‌ছে এর কণ্ঠে;—বক্ষে রয়েছে এর যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সুধা; দেহে জাগছে অসীমের পুলক; গতিতে ফুটছে বিদ্যুতের ঝলক।

দেবতা-বাঞ্ছিত এই নারী—ইহার রূপের মাঝেইতো জীবনের সার্থকতা।

আবেগ-জড়িত কণ্ঠে পুরুষ ব'লে উঠ্‌ল—"নারী, তুমিতো দাসী নও—তুমি প্রণয়িণী, তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব।"

গালের 'পরে গোলাপী আভা টেনে নারী ব'ললে—"আমি তাই।"

এবারেও দেবতা অলক্ষ্যে একটু হাসলেন মাত্র।

* * *

বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল।

পুরুষের আকঙ্ক্ষার তৃপ্তি হ'ল কই? নারীকে দিয়ে হৃদয়ের বিরাট শূন্যতার কতটুকুই বা পূর্ণ হয়েছে?

প্রভাতে দুটি লাজ-চকিত নয়নের সঙ্গে এখন আর-দুটি নয়নের মিলন হয় না; মধ্যাহ্নের নীরবতা এখন আলস্যে পরিণত হ'য়েছে;

মৌন সন্ধ্যা এখন তাহাদের প্রণয় কলরবে মুখরিত হ'য়ে ওঠে না ; রাত্রির নির্জ্জনতা পাষাণ প্রাচীরের মতো দুটি প্রাণীর মধ্যে একটা নির্বাক ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেছে।

হায়, কোথায় গেল সেই কল্পনা-সৃষ্ট জগত আর স্বপ্ন দিয়ে রচা মিলনের সেই প্রথম দিনগুলি !

কণ্ঠ এখন নীরব ; আলিঙ্গন এখন শিথিল ; তবুও নির্বোধ পুরুষ ভাবে—হয়ত একটু চেষ্টায় আগেকার মিলন মুহূর্ত্তগুলি রূপে রসে আবার উজ্জ্বল হ'য়ে ফিরবে।

সন্ধ্যার আঁচলে দিনের তীব্রতা ঢাকা প'ড়ে যায়,—পুরুষ তখন নারীর কণ্ঠে আপন সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে চায়।

নারী বলে—"অবসর নাই, গৃহকর্ম আছে।"

কাজের দিনে পুরুষের কথা নারীর চিত্তদ্বার হ'তে ফিরে আসে ; অকাজের দিনে নারী অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে—দূরাগত সন্তানের পদধ্বনি শুনে।

পুরুষের অভিমান যখন বাষ্পের মত ঘনীভূত হ'য়ে আসে, নারী তখন দখিন হাওয়ার মত পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়।

পুরুষের ধৈর্যের বাঁধ যখন ভাঙ্গে, নারী তাকে ঠেকিয়ে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভাঙ্গনটাকে আরও বড় ক'রে তোলে।

পুরুষ নারীকে যেমন ক'রে চায়, তেমন ক'রে আর পায় না ; নারী পুরুষকে যতই দূরে রাখতে চায়, ততই আরো বেশি ক'রে কাছে পায়।

আদর্শভ্রষ্ট, অধীর, স্নেহভিক্ষুক পুরুষ একদিকে ; অন্যদিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, শান্ত, আত্মসমাহিত নারী। মাঝখানে ছিল জটিল গৃহকর্ম্ম, বিপুল আশা, কুটীল নৈরাশ্য আর সর্বোপরি অপত্য স্নেহের একটা লুকানো ব্যবধান।

একদিকে ছিল পুরুষের নীচ ঈর্ষা, আর এক দিকে ছিল নারীর মহান ছলনা। মাঝখানে ছিল নিরীহ অসহায় এক ক্ষুদ্র মানবক।

*　　　*　　　*

সেও চ'লে গেল; কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ঠিক তেমনিই রইল।

নারী এখন পুরুষের ভয়ে পুরুষেরই কাছে কাছে ফেরে। গর্বান্ধ পুরুষ সেইটুকুই উপভোগ করে মাত্র।

কিন্তু এমন ক'রেও বেশি দিন চ'লল না—দেবতা এবারেও বাদ সাধলেন।

*　　　*　　　*

পুরুষ এক শুভক্ষণে জেগে দেখলে—পার্শ্বে নারী নাই। বেরিয়ে দেখলে—প্রতিবাসীর রুগ্ন গৃহে রোগাহত শিশুর শিয়রে ব'সে আছে সে।

এমন কত না বিচিত্র রজনী তাকে এমনি ক'রেই কাটাতে হয়েছে! মরণপারের কোন্ স্মৃতি তাকে বাইরে আকর্ষণ ক'রেছে—ঘুমন্ত পুরুষ তো কিছুই জানে নাই! তাকে ঘুম পাড়িয়ে নারী চ'লে গেছে—কোন্ আহত, ব্যথিত স্নেহের টানে!

পুরুষকে দেখে নারী ভয়ে সঙ্কোচে পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে গেল।

পুরুষের ভাবের ঘরে সেই মুহূর্ত্তে দেবতা একটা বিপ্লব উপস্থিত ক'রলেন।

তার চোখের একটা পর্দা খুলে গেল।—নারীর এই মাতৃরূপ কেন এতদিন তার চোখে পড়ে নি?

পুরুষের বুকের উপর থেকে যেন একটা গুরুভার পাষাণ অপসৃত হ'ল।

অনেকখানি অনুশোচনা-মিশ্রিত কণ্ঠে ব'ললে—"নারী, তুমিতো শুধু প্রণয়িনী নও, তুমি যে জননীও।"

নারী তার স্নেহ দৃষ্টিতে পুরুষের অনেকদিনের সঞ্চিত গ্লানি মুছে নিয়ে ব'ললে—"আমি যে চিরদিনই তাই।"

সেইদিন পুরুষের কাছে নারী প্রথম ধরা দিলে।

অলক্ষ্যে দেবতার মুখ প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

পুরুষ

কোন্ এক দেশের পুরাণে আছে—বিধাতা ছ'দিন ধ'রে সৃষ্টি রচনা করবার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন।

বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা ছিল যে, একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার কাজে লাগবেন—কেন না সৃষ্টিকার্য তখনো শেষ হয়নি; একটু বাকী ছিল।

কিন্তু কাজের মধ্যে বিশ্রাম নেওয়াটাই হ'ল একটা মস্ত অকাজ; কেন না তার ফলে—

তার ফলে যে কি হ'ল তা' সকল নরনারীই জানে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলে না।

* * *

বিধাতা ওই ছয় দিনে অনেক রকম পদার্থ সৃষ্টি ক'রেছিলেন; রকমারি প্রাণীও বাদ যায়নি।

সবার শেষে তিনি সৃষ্টি ক'রলেন মানুষ।

তাই বা কত রকমের।

বনমানুষ—যাদের কথা প্রাণীবৃত্তান্তে পড়া যায়, এবং যাদের দেখা চিড়িয়াখানাতে পাওয়া যায়;

অতিমানুষ—যাদের দেখা ক্বচিৎ পাওয়া যায় কিন্তু কথা চব্বিশ ঘণ্টাই শোনা যায়;

মনের মানুষ—যাদের দেখা সেকালে কুঞ্জপথে নিত্যই পাওয়া যেত কিন্তু যারা এখন প্রাগৈতিহাসিক জীবের মতই দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

ইত্যাদি এইরূপ আরও কত।

কিন্তু এরা সকলেই পুরুষ মানুষ—ইংরাজীতে যাকে বলে mere men.

বিধাতা নারী সৃজন ক'রতে ভুলে গিছলেন!

ভুলেই যে গিছলেন, এমন কথা শপথ ক'রে ব'লতে পারা যায় না—কেননা নারী সম্বন্ধে ভুল হবার সম্ভাবনাটা এমন কি বিধাতার পক্ষেও নিরাপদ ছিল কিনা সন্দেহ।

আসল কথাটা এই যে, নারীকে তিনি গ'ড়তে চেয়েছিলেন নিজের মনের মতন ক'রে, একটু থিতিয়ে জিরিয়ে, একটু ভেবে চিন্তে, যত অপূর্ব জিনিসের কাব্যিক এবং রাসায়নিক সংমিশ্রণে।

কিন্তু পূর্বে যা' বলা হয়েছে—তাঁর বিশ্রামটাই হ'ল কাল্!

* * *

বিধাতার বিশ্রামের অবসরে পুরুষ দেখলে—

কিন্তু পুরুষ কি দেখলে তা' বলবার আগে তার নিজের সম্বন্ধে একটা কথা ব'লে রাখা ভাল।

এ পুরুষটি হচ্ছে নিতান্তই সাসাসিদে, ঘরোয়া, আটপৌরে রকমের পুরুষ—অর্থাৎ, এর কথা কখনো খবরের কাগজে ওঠেনি এবং এর পরিচয় দিতে সাংখ্যকারও মাথা ঘামান নি।

পুরুষ দেখলে—তার অভাব রয়েছে যথেষ্ট। নিদ্রিত বিধাতার দিকে চেয়ে তার একটু রাগও হ'ল। এবং তার কারণও যে না ছিল, তা' নয়।

কারণটা হচ্ছে এই—

যে পুরাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে লেখা আছে—বিধাতা নিজের রূপে মানুষ সৃজন ক'রলেন। কিন্তু এমন কথা লেখা নেই যে, তাঁর সব রূপটা দিয়েই তিনি পুরুষ মানুষ সৃজন ক'রলেন। পুরাণের তখনও টীকা বেরোয়নি, কাজেই মূর্খ পুরুষ এ কথাটা বুঝলেনা।

সে দেখলে—বিধাতা তাঁর রূপের কাটখোট্টা দিকটা দিয়েই তাকে সৃজন ক'রেছেন। সেটা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু বেচারা পুরুষ কি ক'রেই বা জানবে যে বিধাতা তাঁর রূপের কোমল দিকটা রেখেছিলেন তাঁরই এক সঙ্গিনী সৃজন করবার জন্য। কাজেই তার রাগ হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়। বিশেষ সে পুরুষ—এবং রাগই হচ্ছে পৌরুষের লক্ষণ!

* * *

বিধাতাকে নিদ্রিত দেখে পুরুষের নিজের অভাবটা নিজেই পূরণ ক'রে নিতে ইচ্ছা হ'ল—কেননা সে পুরুষ এবং ইচ্ছানুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে পৌরুষের আর একটা লক্ষণ!

তার ইচ্ছার বেগ অপ্রতিহত—কেননা বিধাতার অংশ সে। বিধাতার সৃজনী শক্তি তার ভিতর সবটা না হোক, কিছু না কিছু ছিলই।

অতএব ইচ্ছা মাত্রই তার অভাবটা পূর্ণ হয়ে মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার যা' ছিলনা—এবং যা' থাকলে হয়ত ভবিষ্যতে এত গোল বাধতনা—তাই সেই মূর্তিতে ফুটে উঠল—লাবণ্য ও কোমলতায় মণ্ডিত হয়ে।

এক কথায়, পুরুষ তার নিজের ইচ্ছায় নারী সৃজন ক'রলে।

* * *

মূর্তিটিতে গড়নের কোন দোষ ছিলনা, তবে বাঁধনে একটু দৃঢ়তার অভাব ছিল।

পুরুষের সীমাবদ্ধ শক্তিতে আর কতই বা সম্ভব!

ফলে, নারী মাধবীলতার মত অসহায় এবং দখিণ হাওয়ার মত অনিশ্চিত হয়ে রইল। তাকে ধ'রতে ছুঁতে পারা যায় না। সে যেন

শুধুই একটা অনুভূতি—একটা গাঢ়ত্ব-বিহীন অস্তিত্ব—যার তুলনা করা যেতে পারে একমাত্র গোলাপী নেশার সঙ্গে।

* * *

পুরুষ কিন্তু তাই দেখেই মোহিত হয়ে গেল। আশ্চর্য নয়—সে যে তার নিজেরি রচনা।

ক্ষুধিত নয়নে পুরুষ তার দিকে চেয়ে ব'ললে—"নারী, তুমি আমারই সৃষ্টি, অতএব তুমি আমারই।"

নারী তার বিলোল কটাক্ষটা পুরুষের উপর ফেলে ব'ললে "তাই বই কি।"

উত্তরটা নিতান্তই নিরাকার রকমের। এর মানে "হাঁ"-ও হ'তে পারে, "না" ও হ'তে পারে। অর্থটা নির্ভর ক'রে বলবার ভঙ্গীর উপর।

পুরুষ সেই ভঙ্গীটাকেই লক্ষ্য না ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"অর্থাৎ—?"

—"অর্থাৎ আমি তোমার নই।"

—"তবে তুমি কার্?"

এ প্রশ্নের উত্তর নারীর কাছে অত সহজে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ এ সত্যটা বোধ হয় জানত না।

নারী কোনও উত্তর না দিয়ে একবার চারিদিক চেয়ে দেখলে—স'রে পড়বার কোন উপায় আছে কিনা।

পুরুষ তাই দেখে প্রসারিত বাহুতে নারীকে জড়িয়ে ধ'রলে। ব'ললে—"আমিই তোমায় সৃষ্টি করেছি, অতএব তুমি আমারই। আমি তোমায় ছাড়তে পারিনা।"

নারী দুর্বল। পুরুষের সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে না জানত। পালাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে ব'ললে—"আচ্ছা তাই। তুমি আমার যতটুকু ধ'রতে পেরেছ, আমি ততটুকুই তোমার।"

সেই প্রথম নারী-দেহ পুরুষের কাছে অধীনতা স্বীকার ক'রলে।

* * *

পুরুষ প্রথমটা তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এই তুষ্টিভাবটা বেশি দিন রইল না। সৃষ্টির একটা রহস্য।

সে ইতিমধ্যে নারীকে বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। সেখানে নারীর যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল—প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে।

নারী কোনই আপত্তি ক'রলেনা। এবং সে যতই পোষ মানতে লাগল, পুরুষ ততই ঘরের বেড়াটা দূর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে লাগল।

কিন্তু বেড়াটা ছিল—দূরে থাকার দরুণ দেখতে না পাওয়া গেলেও!

পুরুষের বিশ্বাস—নারী সে বেড়াটার সন্ধানই জানে না। একদিন তাই সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এখন তো আর পালাবার নাম কর না, পালাবার শত সুযোগ সত্ত্বেও?"

নারী অন্যমনস্ক ভাবে ব'ললে—"কী-ইবা দরকার আছে পালাবার?"

—"তা'হ'লে স্বীকার ক'রছ, তুমি এখন একান্ত আমারই?"

—"তুমি যদি তাই ভেবে সুখী হও, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই।"

—"তবে এটা সত্যি নয়?"

—"তুমিই বল।"

—"তবে আছ কেন? চ'লে গেলেই তো পার। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

—"ওটা একটা মিথ্যা কথা।......তবে আছি কেন? বোধ হয় সেটা অভ্যাসের দোষ।.....বিশেষ একলা বনে বনে খাদ্যসংগ্রহ করা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার।"

—"শুধু এই—?"

—"তা' ছাড়া আরও কিছু হয়ত থাকতে পারে . সেটাও বোধ হয় অভ্যাসের দোষ ।"

নারী আর অপেক্ষা না ক'রে গৃহকর্মে চ'লে গেল ।

পুরুষ কি ক'রবে বুঝতে না পেরে তার পথের পানে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল ।

সেইদিন পুরুষের মন নারীর কাছে প্রথম অধীনতা স্বীকার ক'রলে ।

* * *

বেচারা পুরুষ !

আজও সে নারীর পথের পানে তেমনি ক'রেই চেয়ে আছে ।

সে নিজেকে বোঝাতে পারে না, নারীও নিজেকে বুঝতে দেয় না ।

কিন্তু গৃহস্থালি ঠিক নিয়ম মতই চ'লছে !

কবি

কিশোর কবির তন্দ্রালস চোখের সামনে স্বপ্নদেবী তার প্রিয়ার রূপটিকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-খসা ফুলের মত রূপটি শূন্যে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটি মাধুর্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মত।

কবি জেগে উঠল। কল্পনা দেবী তখন তার কানে কানে ব'ললে—"কবির তৃষিত হৃদয় সে স্নিগ্ধ ক'রে দেবে—তার প্রেমে। কবির দৈন্য, লজ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে—তার ত্যাগে; কবির জীবন পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে—একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।"

কবি সেই স্বপ্নলব্ধার সন্ধানে বেরুলো—অরণ্যে নয়, পর্বতে নয়, স্রোতস্বিনীর তীরেও নয়, নির্ঝরিণীর ধারেও নয়—তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে, শ্মশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিলল না।

* * *

এমনি ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর পর বছর কেটে গেল। কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে প'ড়ল।

তার খোঁজার বিরাম ছিল না।

কত বরাননী কবির পথে এসে দাঁড়াত; ব'লত—"আমিই তোমার সেই প্রিয়া।"

সন্ধান-ক্লান্ত কবি মনে ভাবত—হয়ত বা এ সেই। মুখে ব'লত—"দেবী, আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠল!"

দিনের পর দিন, হয়ত বা মাসের পর মাস কেটে যেত। নারী জিজ্ঞাসা ক'রত—"তৃষ্ণা মিটেছে কি ?"

কবি ব'লত—"না।"

নারী ব'লত—"আমার মিটে গেছে। তুমি এইবার যাও।"

কবি চ'লে যেত। তার ভাঙ্গা বুকের চোয়ানো রক্তে গোলাপ লাল হয়ে উঠত ; তার বিষণ্ণ মুখের করুণ হাসিতে জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসত।

সমাজ গলা উঁচু ক'রে ব'লত—ছিঃ ছিঃ !

কবি মাথা নীচু ক'রে ভাবত—এ কী ভুল !

* * *

কবির যৌবনও ফুরোলো, কবিও শয্যা গ্রহণ ক'রলে। মৃত্যুদেবী শিয়রে এসে ব'সল।

কবি জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এইবার তাকে পাব তো ?"

মৃত্যুদেবী ব'ললে—"এখনও সময় হয় নি।"

"মরণেও নয় ?" কবির ক্লান্ত কণ্ঠে কথা জড়িয়ে এল—"এ খোঁজ আর কতদিন চ'লবে ?"

উত্তর এল—"সৃষ্টি যতদিন।"

কবির শেষ দৃষ্টি সৃষ্টিরই মধ্যে জেগে আছে—সেই প্রতীক্ষায়।

শিল্পী

শিল্পী ছবি আঁকত।

রাজার সেগুলো পছন্দ হ'ত না; সভাষদগণের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠত; নাগরিকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

শিল্পীর তবুও ছবি আঁকার বিরাম ছিল না।

* * *

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীর অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে তুলিকা আপনিই খ'সে প'ড়ল।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—"রাজার কাছে যাও; তাঁর কৃপাকটাক্ষে তোমার সকল অভাব দূর হয়ে যাবে।"

মানস-প্রিয়ার আধ-আঁকা ছবিখানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায় এসে দাঁড়ালো।

রাজা ব'ললেন—"উদ্যান-বাটিকার ভিত্তিগাত্রে আমার পূর্বপুরুষ-গণের কীর্তিকাহিনী তোমার তুলির মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে।"

সভাষদেরা আশ্বাস দিলে—"আশাতীত পুরস্কার পাবে।"

নাগরিকদের আশা হ'ল—দেওয়াল-জোড়া ছবি দেখে চক্ষু সার্থক ক'রবে।

রাজপ্রসাদপুষ্ট হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে।

* * *

শতেক রাজার মুখচ্ছবি ভিত্তিগাত্রে ফুটে উঠল; অমাত্যদের ভাবহীন মুখের ছবি অলিন্দের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল; নাগরিকদের প্রাণহীন মুখের রেখা শোভাযাত্রার মধ্যে ছড়িয়ে রইল।

শিল্পীর কাজ সাঙ্গ হবার পর—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন; সভাষদেরা দিলে বাহবা; নাগরিকেরা দিলে অভিনন্দন।

গৃহলক্ষ্মীর মুখ গর্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

*　　　*　　　*

শিল্পীর বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তার মানস-প্রিয়ার অর্ধ-সমাপ্ত মুখখানি রেখায় সমাপ্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

রং-এর সঙ্গে রং মিশ্‌ল, রং-এর পরে রং প'ড়ল,—কিন্তু মুখের মৃত্যু-বিবর্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না।

শিল্পী আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রলে, বিত্ত সম্পদ দূরে ফেললে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিলে;—কিন্তু সে মুখে প্রাণের আভাষ ফুটে উঠল না।

*　　　*　　　*

শিল্পী তখন কলাদেবীর দ্বারস্থ হ'ল।

দেবী ব'ললেন—"শিল্পীর বুকের রক্তেই তার মানস-প্রিয়ার মুখে জীবনের আভা ফুটে উঠে; শিল্পীর জীবন বিনিময়ে আমিই তার মানস-প্রিয়ার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি।"

শিল্পী ব'ললে—"আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুন।"

দেবী উত্তর ক'রলেন—"তাতো পারি না। স্বর্ণমুদ্রার রঙে যেদিন তুলি রাঙিয়েছিলে, সেদিন হ'তে তুমি অশুচি। তোমার আত্ম বলিদানে অধিকারও নাই, ফলও নাই।"

শিল্পীর লজ্জাহত হাত হ'তে তুলিকা খ'সে প'ড়ল।

তার মানস-প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূন্যে চেয়ে রইল।

গাধা

গাধা ব'ললে—"এত কম খেয়ে এত বেশি কাজ যে করে, সে নিতান্তই গাধা।"

ধোপা ব'ললে—"তা' নইলে ওটুকুও যে জুটবে না।"

"না হয় নাই জুটল"—ব'লে গাধা খাওয়া এবং কাজ করা দুই-ই এক সঙ্গে ত্যাগ ক'রলে।

প্রায়োপবেশনের ফলে তার স্বশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি হ'ল।

*   *   *

কিন্তু সেই "স্বশরীর" অবস্থাটাই যত গোল বাধালে।

গাধা স্বর্গে গিয়েও তার গর্দভ দেহের পরিবর্তন দেখতে পেলে না। সেটা ঠিক তেমনিই আছে—তবে সূক্ষ্মভাবে; এই-যা!

তখন সে একেবারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দরবারে হাজির হ'ল। ব'ললে—"প্রভু, স্বর্গেও আমার এই দশা?"

ব্রহ্মা ব'ললেন—"কি ক'রব বাপু? তোমার ভিতরের গাধাত্ব তো এখনো ঘোচেনি; আর সেটা না ঘুচলেতো তুমি দিব্য দেহের অধিকারী হ'তে পার না।"

গাধার মুখখানি ম্লান হয়ে গেল; দেখে ব্রহ্মার দয়া হ'ল। একটু নরম সুরে ব'ললেন—"তবে যদি মর্তে আবার জন্ম নিতে চাও—"

ব্রহ্মার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে গাধা ব'লে উঠল—"তবে এই বর দিন যেন আর গাধা শরীর পরিগ্রহ ক'রতে না হয়; মানুষ হয়ে জন্মাই যেন এবার।"

ব্রহ্মা ব'ললেন—"তথাস্তু।"

*   *   *

ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হবার নয়---গাধা মর্তে মানুষ হয়ে জন্মাল। যে-সে মানুষ নয়—একেবারে মহাকুলীন রজক-বংশাবতংশ হয়ে।

মানুষ হয়ে জন্মালে যা' হয়, গাধারও তাই হ'ল। অর্থাৎ সে পূর্বজন্মের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গাধাদের সঙ্গে ঠিক ধোপাদের মতই ব্যবহার ক'রতে লাগল।

ব্রহ্মার আশীর্বাদের জোর ছিল, তাই তার গায়ে আঁচড়টুকও প'ড়ল না। তার জাঁক জমক দেখে পাড়ার অন্য ধোপাদের চোখ টাটাতো, তার ব্যবহারে পাড়ার বুড়োদের শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে উঠত এবং তার চাল-চলনে পাড়ার ছেলেদের জিতের আড়্ ভেঙ্গে যেত। তবুও, আগেই যা' ব'লেছি, তার গায়ে আঁচড়টুকুও লাগল না।

তারপর যখন আয়ু ফুরিয়ে এল, তখন পুত্র-কলত্র, নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত হয়ে, গঙ্গাতীরে, "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" শুনতে শুনতে গাধা মনুষ্য-দেহ ত্যাগ ক'রলে।

* * *

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের ফলে তার স্বর্গলাভ হ'ল।

কিন্তু স্বর্গে গিয়ে আবার সেই বিপদ। এত ক'রেও তার সূক্ষ্ম দেহটা মনুষ্যাকারে পরিণত হ'ল না—স্বর্গেও।

ব্যাকুল হ'য়ে গাধা আবার ব্রহ্মার পায়ের কাছে গিয়ে প'ড়ল।

ব্রহ্মা ব'ললেন—"কি ক'রব, বাপু? মনুষ্য জন্ম চেয়েছিলে, তা-ই দিলুম। তাতেও তো তোমার গাধাত্বটা ঘোচাতে পারলে না!"

গাধার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল—অর্থাৎ গাধাদের মুখ যতটা শুকোতে পারে—ওরই মধ্যে একটু বিশিষ্ট রসাভাষ রেখে।

তাই দেখে ব্রহ্মার আবার দয়া হ'ল। ব'ললেন—"পুনর্জন্ম না হ'লে তো আর গাধাত্ব ঘুচবে না। এবার কি হয়ে জন্মাতে চাও,

বলো ? যদি চতুষ্পদ হয়ে জন্মাতে চাও, তবে একেবারে সুন্দর বনে জন্ম নিতে পার—তবে সেখানে তোমার সঙ্গী মিলবে না। আর যদি যদি দ্বিপদ-জন্ম নিতে চাও তো সুন্দরবনেরই কাছাকাছি এমন একটা দেশে আবির্ভূত হ'তে পার, যেখানে সমাজের কোন স্তরেই তোমার জাত-ভাইদের দর্শন ও সঙ্গ সুদুর্লভ হবে না।"

গাধা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। বোধ হয় ভাবছিল যে, কোন্ জন্মটা ভাল। তারপর ধীরে ধীরে ব'ললে—"প্রভু, আপনার ইচ্ছাই সফল হোক।"

কথাটা ঠিক গাধার মত হ'ল না। অতএব উত্তরে ব্রহ্মার বোধ হয় বলা উচিত ছিল—"হে গর্দভ, আমার ইচ্ছায় এখনি তুমি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হও।" কিন্তু তা' হ'লনা, কেননা স্বর্গটা ঠিক যাত্রার আসর নয় এবং ব্রহ্মা আর যাই হোন, যাত্রাদলের অধিকারী নন্।

ব্রহ্মা তাঁর চারটি মুখের একটি মুখ দিয়ে এতক্ষণ হাই তুলছিলেন; দ্বিতীয় মুখটি দিয়ে হাসছিলেন; এবং তৃতীয় মুখটি দিয়ে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রছিলেন। গাধার উত্তরটা তাঁর কানে পৌঁছিল কিনা জানি না—তবে তিনি অভ্যাস বশতই চতুর্থ মুখটি দিয়ে ব'লে ফেললেন —"তথাস্তু।"

* * *

ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হবার নয়। গাধাকে পুনর্জন্ম নিতে হ'ল। কিন্তু কোন্ রূপ ধারণ ক'রে সে এবার জন্ম নিলে, সেটা অনিশ্চিত রয়ে গেল। ব্রহ্মা তো কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নি এবং গাধাও যে কিছু স্বীকার ক'রবে, তেমন গাধাই সে নয়। চিত্রগুপ্ত যাঁর খাতা থেকে আমি এ কাহিনীটা "না বলিয়া গ্রহণ" ক'রেছি—তিনিও এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি।

তবুও আশা করা যাক—এবার মৃত্যুর পর তার গাধাত্বটা ঘুচবে।

ত্যাগী

দীক্ষার সময় আচার্য ব'ললেন—'বৎস, নীতির উপরেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা ; এইটি মনে রেখো।"

শিষ্যের মন উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠল।

তাকে তো নূতন ক'রে কিছু ত্যাগ ক'রতে হবে না ; সেতো জীবনে কখনো নীতির পথ হ'তে চ্যুত হয় নাই ; জ্ঞানত-অজ্ঞানত কখনো তার পদস্খলন হয় নাই ; পাপকে দূরে রেখে জীবনের দিনগুলো একরূপ আড়ষ্ট ভাবেই কাটিয়ে এসেছে সে।

অতএব ধর্ম তার করতলগত। এখন শুধু ইষ্টলাভ হ'লেই সে সফলকাম হয়।

তারই আয়োজন সুরু হ'ল।

* * *

বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল।

অস্থিচর্মসার দেহ আর অন্ধতমসাবৃত মন—এই নিয়েই সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ ক'রে ব'সে থাকে ; কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কিছু তো তার মনের আকাশে প্রতিফলিত হ'ল না।

মন তার উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

বিশ্বকে সে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু মনে হয় বিশ্বের দ্বারা সে তো পরিত্যক্ত হয় নাই। পাপের বন্ধন হতে মুক্ত সে—তবু আজিও এ কিসের বন্ধন তাকে ঘিরে রয়েছে ?

সাধক হতাশ হয়ে পড়ে।

কিন্তু সৃষ্টিকে যে বিস্মৃতির অন্ধকূপে প্রেরণ ক'রতে চায়, তাকে হতাশ হ'লে চ'লবে কেন?

সে তাই আবার আসন ক'রে বসে।

প্রকৃতি দেবীর মমতা-দৃষ্টি সেই চর্মাবৃত কঙ্কালের উপর প'ড়ে বিশ্বে একটা দীর্ঘনিশ্বাস জাগিয়ে তোলে; স্রষ্টা-পুরুষ উদাস নয়নে চেয়ে থাকেন।

* * *

এমনি ক'রে কত বৎসর কেটে যাবার পর—লুপ্ত স্মৃতি ও শিথিল ইন্দ্রিয় গ্রাম—এই সম্বল নিয়ে সাধক একদিন জেগে উঠল; ব'ললে —"এই তো উপলব্ধি।"

গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ল—"এই তোর উপলব্ধি?"

* * *

সাধু বাইরে চেয়ে দেখলে—

প্রকৃতি তার শ্যামল হাতখানি তারই জন্য প্রসারিত ক'রে রেখেছে; বিহগ কণ্ঠ তারই মঙ্গলাচরণ ক'রছে; ফল, ফুল আর নির্ঝরের জল তারই অভিষেক মন্ত্র প'ড়ছে।

সাধু ভাবলে—"এতো আমারই প্রাপ্য, কেননা আমি প্রকৃতিজয়ী।"

আরও একটু এগিয়ে দেখলে—

নগরোপান্তে কুটীর দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

সাধুকে ব'ললে—"তপোধন, আমি যে কত যুগ ধ'রে তোমারই প্রতীক্ষায় র'য়েছি। তপোক্লিষ্ট দেহে সেবা গ্রহণ ক'রে আমায় পুণ্য প্রভায় মণ্ডিত কর।"

আত্মপ্রসাদ-গর্বিত সাধু মনে ভাবলে—"সেবা তো আমারই প্রাপ্য; নারীরূপা প্রকৃতির প্রভু তো আমিই।"

* * *

প্রসন্ন শান্তিতে কয়টা দিন কেটে গেল।

রমণীর স্নেহযত্ন অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু সাধুর মনে কোথায় এবং কখন যে বিকার আরম্ভ হ'ল, তা' সে নিজেই বুঝতে পারলে না।...

বুভুক্ষু হৃদয়ের সমস্ত বাসনা একত্রিত ক'রে সাধু এক অতর্কিত মুহূর্তে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"এত দিন কোথায় লুকিয়েছিলে তুমি, নারী?"

শান্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে নারী উত্তর ক'রলে—"তোমারই মনের মধ্যে।"

—"তবে এতদিন জানতে দাওনি কেন, নিষ্ঠুর?"

—"সত্যই আমি নিষ্ঠুর। বিশ্বের মাঝে তোমার ইষ্ট যেথা বিরাজ ক'রতেন সেই জায়গাটা আড়াল ক'রে এতদিন দাঁড়িয়েছিলুম আমি—নীতির মুখোস প'রে।"

—"আর আজ?"

—"আজ সময় হয়েছে, তাই ধরা দিতে এসেছি।"

* * *

রাত্রি শেষে সাধু বুকের উপর থেকে রমণীকে দূরে ফেলে দিলে।...

কী কুৎসিত, কী বীভৎস মূর্তি তার!

এ-কেই সে এতদিন দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা ক'রে এসেছে!...

রমণীর কুটীল হাস্য অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠল—একটা বিদ্যুৎ ঝলকের মত।

সাধু সেই আলোকে দেখলে—

বিশ্বের সমস্ত দুর্বলতা, সমস্ত পাপ তারই হৃদয়-দ্বারে দাঁড়িয়ে র'য়েছে—তারই শরণপ্রার্থী হয়ে।

তাদের ফিরিয়ে দিলে তো তার নিজের মুক্তি নাই!

সাধুর মনশ্চক্ষু খুলে গেল। ইহাই কি বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম অনুভূতি!...

রমণীর বিদ্রূপ হাস্যে ক্ষুদ্র কুটীর আবার মুখরিত হয়ে উঠল... যন্ত্র চালিতের মত সাধুর হস্ত রমণীর কণ্ঠদেশ স্পর্শ ক'রলে...পরক্ষণে রমণীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতলে লুটিয়ে প'ড়ল।

* * . *

শিষ্য এসে আচার্যের পায়ে মাথা রেখে আর্তকণ্ঠে ব'লে উঠল—"প্রভু, এতদিনের সাধনা আজ বিফল হ'ল!"

আচার্য স্নেহার্দ্র স্বরে ব'ললেন—"বৎস, এতদিনের পর তোমার সাধনা আজ সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়ালো।"

পুতলি

তার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটা না মনে থাকলেও ক্ষণটা এখনও মনে আছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা—অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভা জন বিরল পার্বত্য পথে সেদিন একটা কুহক রচনা ক'রেছিল।

* * *

তারপর সে যখন আমাদের বাড়িতে এল—চিরদিনের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে—সেদিন আমাদের কী আনন্দ আর এতগুলি অপরিচিত মুখের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে তার সে কী সংকোচ! সে যে গরীবের ঘরে প্রতিপালিত—জন্মটা বড় ঘরে হ'লেও—এ কথাটা বোধ হয় সে তখনও ভুলতে পারেনি।

বাড়ীর সকলে তার পূর্বেকার নামটা বদলে নূতন নামকরণ ক'রলে ডলি বা পুতলি—তার পুতুলের মত স্বচ্ছ আর হরিণীর মত সরল বিশ্বস্ত চোখ দুটি দেখে। সে-ও তাই বিনা আপত্তিতে মেনে নিলে।

সে তখন দেখতেও ছিল ছোট্টটি আর বয়সটাও ছিল সেই মতো।

* * *

তারপর কতদিন কেটে গেল।

ভালবাসার মৃদু উত্তাপে ডলির সংকোচ তুষারের মত গ'লে গিয়ে কেমন ক'রে স্রোতস্বিনীর মুখরতায় পরিণত হয়েছিল, তা' সে নিজেও জানতে পারেনি বোধ হয়। কেমন ধীরে ধীরে সে আমার হৃদয়ে নিজের স্থানটি অধিকার ক'রে নিয়েছিল! বাড়ির কোথাও আদর-ভাল-বাসার ত্রুটী ছিল না এবং সে-ও তার স্নেহ বন্ধুত্বের বন্ধনে আত্মীয় অভ্যাগত সকলকেই বেঁধে ফেলেছিল। তবুও সে এটা ভোলেনি যে, তার সমস্ত সুখদুঃখ আমাকেই কেন্দ্র ক'রে ঘিরে রয়েছে, আর আমিও জানতুম যে, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসাটুকু আমাতেই এসে

বিরাম পেয়েছে। নিদাঘ দিনে তার ক্লান্ত চোখের নির্ভর দৃষ্টি আর শীতের রাতে বিছানার ভিতর তার সুনিবিড় স্পর্শ আমাকে ওই কথাটাই বিশেষ ক'রে জানিয়ে দিত।

* * *

তারপরে আরও কতদিন কেটে গেল।

সমস্ত নেশার মত নূতনত্বের নেশাও আমার মন থেকে ধীরে ধীরে স'রে যেতে লাগল। নিজেকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি কর্তব্যের দাবীও মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল। কোথায় গেল ছুটীর সেই দীর্ঘ দিনগুলি আর কোথায় প'ড়ে রইল আমার অবসরের জীবন্ত সাথী আর খেলার ঘুমন্ত স্মৃতি!

কিন্তু ডলি সেটা ঠিক এ ভাবে স্বীকার ক'রে নিতে পারলে না। এবং এইখানেই আরম্ভ হ'ল সেই নীরব ট্র্যাজেডি যার কথাগুলি কোন নাট্যকারের লেখনীমুখে কোন দিন ফুটে ওঠেনি, কিন্তু জীবন রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় প্রতিদিনই চ'লে আসছে।

সকাল বেলা কাজের মধ্যে আমার আপিস-কেদারার ফাঁকটুকু সে অধিকার ক'রে ব'সত। আমি ব্যস্ত হয়ে ব'লতুম—ডলি, এখন নয়; কাজ আছে।

সে চ'লে যেত। তার অভিমান দৃষ্টিটুকু আমার কাজের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে যেত, তার কিছুই খবর থাকত না।

ক্লান্ত সন্ধ্যার বিরল অবসরে আরাম-কেদারার মধ্যে আমার বুকের কাছে তার মুখের সংকোচ স্পর্শ অনুভব ক'রতুম। তার রেশমের মত চুলগুলির ভিতর আঙুল রেখে ব'লতুম—ডলি, এখন যাও; বড়ই ক্লান্ত।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখতুম—বিছানার আরাম ছেড়ে দিয়ে সে যে কখন নীচের গালিচাতে শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছে, কিছুই টের পাইনি।

তাকে কর্ম অথবা অবসর কিছুরই সাথী ক'রে নিই নাই। কয়েকটা অলস দিনে সে আমার চিত্ত বিনোদনের উপাদান জুগিয়েছিল মাত্র।

* * *

তাই সে যে আমাকে একেবারেই ছেড়ে চ'লে যাবে—এতে আশ্চর্য হবারই বা কি আছে? তবে এ কথাটা সে সময় ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

সে দিনের কথা সংক্ষেপেই ব'লব।

সেদিন বিলাতী স্যাকরার দোকান থেকে তারই জন্যে আনা নূতন কণ্ঠহারটা একেবারেই কাছে রাখতে পারলুম না; দূরে ফেলে দিলুম। সেটা আমার কতকটা অনুতাপ এবং অনেকটা অনুগ্রহ দিয়ে গড়া—তাতে স্নেহ-ভালবাসার নাম গন্ধও ছিল না বোধ হয়।

* * *

সেদিন বিনিদ্র রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে ডলিকে যেন আবার নূতন ক'রে পেলুম। মনে মনে ব'ললুম—"বন্ধু, তুমি যে নূতন আশ্রয় পেয়েছ, সেখানে তোমার ভালবাসা যেন কখন ক্ষুণ্ণ না হয়! নীরব অবহেলার অপমান বিষে তোমায় যেন কখনো জর্জরিত হ'তে না হয়! আমাকে ত্যাগ ক'রে তুমি ভালই ক'রেছ। তুমি সুখী হও।"

* * *

তার হৃদয়ের সমস্ত অভিমানটুকু নিয়ে ডলি চ'লে গেছে। আমার হৃদয়ে অনুতাপের একটা ক্ষত রেখে গেছে মাত্র!

ডলিও চ'লে গেছে আমারও সেই থেকে কুকুর পোষার সখ মিটে গেছে!